একক-১ ❑ লিঙ্গ ও জনপ্রশাসন

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ লিঙ্গ ও জনপ্রশাসনের অর্থ

১.৪ জনপ্রশাসনে পিতৃতন্ত্র

১.৫ মানব মূলধন তত্ত্ব ও সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব

১.৬ জনপ্রশাসনে লিঙ্গ বৈচিত্র্যের সুবিধা

১.৭ লিঙ্গ ও জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ইউ.এন.ডি.পি. (U.N.D.P) ও অন্যান্য প্রতিবেদন

১.৮ নারী ও জনপ্রশাসন—সামাজিক—সংস্কৃতিগত বাস্তবতা

১.৯ বিশ্বায়ন—সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ

১.১০ বিশ্বায়ন ও নারী

১.১১ সরকারি অফিসে লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিরোধ বা সমাপ্তি সংক্রান্ত আইনসমূহ (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক)

১.১২ জনপ্রশাসনে প্রান্তিক লিঙ্গ পরিচয় সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কেস স্টাডি

১.১৩ বৃহত্তর লিঙ্গ সমতার জন্য একটি চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

১.১৪ উপসংহার

১.১৫ নমুনা প্রশ্নাবলী

১.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করা যাবে এবং তাদের বিশ্লেষণ করা সহজ হবে :

- লিঙ্গ ও জনপ্রশাসনের অর্থ।
- জনপ্রশাসনে ও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অসম প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করে রচিত মানব মূলধন তত্ত্ব ও সামাজিক মূলধন তত্ত্ব।

- ইউ. এন. ডি. পি. ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন, যেগুলি জনপ্রশাসনে লিঙ্গ-বৈষম্যের ধারার ওপর আলোকপাত করে।
- বিশ্বের অধিকাংশ সমাজেই লিঙ্গ-বৈষম্যের উপস্থিতি এবং লিঙ্গ-বৈষম্যের জন্য দায়ী কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা।
- বিশ্বায়ন এবং লিঙ্গ-বৈষম্যের সম্পর্ক।
- সরকারি অফিসে লিঙ্গ-বৈষম্য প্রতিরোধ সংক্রান্ত কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন।
- জনপ্রশাসনে লিঙ্গ-প্রশ্নসংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক কেস স্টাডি এবং লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।

১.২ ভূমিকা

খাদ্য, বাসস্থান, পানীয় জলের যোগান বা গৃহপরিচালনা সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা সমাজে নানাভাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, পরিচালনা, বা শাসনসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে তারা বিবেচনার বাইরে ছিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রাষ্ট্রপরিচালনা, প্রশাসনিক নির্দেশদান ইত্যাদি কাজের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিকোণকে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রগুলিতে নারীও পুরুষের সমান অংশগ্রহণের লক্ষ্য অর্জনের প্রতি চ্যালেঞ্জগুলিকে অতিক্রম করতে হবে এবং জনপ্রশাসনের আলোচনায় লিঙ্গপ্রেক্ষিতে যুক্ত করার পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে। সমাজ পরিচালনা ও সংগঠনের আরো নিরাপদ ও টেকসই উপায় বিকাশের জন্য আমাদের প্রচেষ্টাগুলির কেন্দ্রীয় বিষয় হল লিঙ্গমাত্রা।

১.৩ লিঙ্গ ও জনপ্রশাসনের অর্থ

লিঙ্গ বলতে বোঝায় নারী বা পুরুষ হিসাবে অবস্থানকে। লিঙ্গ হল জৈবিক পার্থক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গযুক্ত। লিঙ্গ পার্থক্যের উৎপত্তি হয় একদিকে জৈবিক ক্রোমোজোম, মস্তিষ্ক কাঠামো এবং হরমোনের প্রভৃতি থেকে এবং অন্যদিকে সামাজিকভাবে নির্মিত লিঙ্গ ভূমিকা থেকে। অর্থাৎ নারী ও পুরুষ সংক্রান্ত পার্থক্য এবং উভয়ের পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিসর জৈবিক হতে পারে (নারী বা পুরুষ হিসাবে অস্তিত্ব), লিঙ্গ পরিচয় ও লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক কাঠামো (লিঙ্গ ভূমিকা ও সামাজিক ভূমিকা)ও হতে পারে। সমাজের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক আদানপ্রদান ও মিথষ্ক্রিয়ার ফলে সামাজিকভাবে নির্মিত ভূমিকা, দায়িত্ব ও পরিচয় সৃষ্ট হয়—পুরুষ ও নারী বা বালক ও বালিকা হিসাবে। লিঙ্গ প্রেক্ষিত বিষয়টি সমাজে লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান। ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজের প্রাত্যহিক জীবনে তা সক্রিয় ও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা ও নিয়মনসমূহের মধ্যে লিঙ্গভূমিকা প্রতিফলিত হয়।

সমাজের লিঙ্গ সম্পর্কগুলি পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে চারটি ক্ষেত্রে—

(১) লিঙ্গভিত্তিক পরিচয় বা শারীরিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যসমূহের সমাহার (যা সমাজের মধ্যে বালক ও বালিকা এবং নারী ও পুরুষের পরস্পরের থেকে পৃথক করে রাখে);

(২) ব্যক্তিসত্তার অনুভূতি বা নারী ও পুরুষ বা বালিকা ও বালক হিসাবে তাদের স্বতন্ত্র ভূমিকা সম্পর্কে সমাজের ধারণা বা বোধ;

(৩) বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা উপরোক্ত বোধ বা ধারণা দ্বারা পরিচালিত কার্যসমূহের ধরন;

(৪) সামাজিক অবস্থান বা পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজে নারী বা পুরুষ হিসাবে অধিকৃত স্থান।

লিঙ্গ সমাজের সব ক্ষেত্রগুলিকেই প্রভাবিত করে—সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। এই সব ক্ষেত্রগুলির মধ্যে লিঙ্গ সংক্রান্ত সামাজিক সম্পর্কগুলি ন্যায়সঙ্গত নয়—সেগুলি সর্বত্রই বালিকা ও নারীদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল। সমাজের লিঙ্গ সম্পর্কগুলি এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে, নারীরা পরিবার, সম্প্রদায় বা সমাজের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় অধস্তন স্থান অধিকার করে। পরিসংখ্যানগতভাবে সামাজিক মইয়ের স্তর নির্বিশেষে তারা পুরুষদের তুলনায় মৌলিক সামাজিক সুবিধাগুলির ভোগ থেকে অনেক বেশি বঞ্চিত। একই শ্রেণী বা শ্রেণীগত বিভাগে অবস্থান করলেও পুরুষদের তুলনায় নারীরা পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার অনেক কম ক্ষমতা ভোগ করে। দারিদ্র্যের মাত্রাগত দিক থেকে দেখলে নারীদের দারিদ্র্যের বিষয়টি বেশ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। (বিশ্বের দরিদ্রদের মধ্যে ৬০%-ই হল নারী)। নারীরা অনেক কম সম্পত্তি ও সম্পদের মালিকানা ভোগ করে, তাদের রোজগার কম, সম কাজের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় তাদের মজুরী কম, দক্ষতার দিক থেকে তারা নিচে অবস্থান করে, দক্ষতাবিকাশের সুযোগ তারা কম পায় এবং পরিবার ও সরকারি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদের যোগ কম থাকে। তারা যৌন নির্যাতন এবং গার্হস্থ্য ও অন্যান্য ধরনের হিংসার শিকার হয়। সমাজের পুরুষ সদস্যরা নানাভাবে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে নারীরা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি দুর্বল। তারা সর্বত্র পুরুষদের দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হয়। ফলে সব সমাজেই লিঙ্গভিত্তিক অন্যায্য ও নির্যাতন দেখা যায়।

জনপ্রশাসন হল সেইসব কাজ যেগুলির উদ্দেশ্য হল উপযুক্ত কর্তৃত্ব দ্বারা ঘোষিত জননীতির পরিপূরণ বা প্রয়োগ। এটি সরকারের এক্তিয়ারের বিষয়। এটি হল প্রধান হাতিয়ার যার সাহায্যে জাতীয় নীতি ও কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ঘটে। আদর্শগতভাবে জনপ্রশাসনকে সাম্য, নিরপেক্ষতা, দায়িত্ববোধ, সততা ও ন্যায়বিচারের নীতিসমূহের দ্বারা পরিচালিত করা প্রয়োজন; জনপালনকৃত্যক এমন একটি অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে কাজ করবে, যেখানে নারী ও পুরুষ সমভাবে অংশগ্রহণ করতে ও নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে এবং উভয়েই পরিচালনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার শামিল হতে পারে। এই আদর্শের সঙ্গে বিশ্ব বাস্তবতা মেলে না। যদিও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত লক্ষ্য যে জনপ্রশাসন ও রাজনীতিতে ন্যূনতম ৩০% নারী নেতৃত্ব পদে থাকবে, বাস্তবে জনপ্রশাসনের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের উপস্থিতি খুবই কম। অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশেই জনপ্রশাসন হল প্রধানত একটি পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, যা লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহ্য ও প্রথাসমূহকে বজায় রাখে।

১.৪ জনপ্রশাসনে পিতৃতন্ত্র

ইতিহাসের ধারায় দেখা গেছে যে জনপ্রশাসন ও আমলাতন্ত্র সংক্রান্ত জনগণের ভাবনাচিন্তার ওপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে লিঙ্গ বিষয়টি জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নারী-পুরুষ বিভাজন

প্রসঙ্গটি অনুধাবন না করে জনপ্রশাসনের আলোচনা সম্ভব নয়। আজকের যুগের জনপ্রশাসনেও লিঙ্গবিবেচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যদিও সাধারণভাবে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা ও লিঙ্গ বৈষম্যের অবসানকে উদ্দেশ্য হিসাবে প্রচার করা হয়।

জনপ্রশাসন শাস্ত্রের বিভিন্ন আলোচনায় প্রথম দিকে সংখ্যালঘু দৃষ্টিকোণকে উপেক্ষা করা হত এবং যেসব লেখায় নারীদের অভিজ্ঞতা বা অবদানের কথা থাকত, সেগুলি অগ্রাহ্য করা হত। ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে লিঙ্গ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। আমেরিকার পৌর অধিকার সংক্রান্ত আইনসমূহ সরকারি বিষয়ে সম সুযোগ প্রবর্তন করে এবং পেশা সুরক্ষা আইনগুলি সকলের পেশাগত স্বার্থসংরক্ষণের ওপর জোর দেয়। ফলে তখন থেকে জনপ্রশাসনে মার্কিন সংবিধান রচয়িতাগণের বক্তব্য এবং জনপ্রশাসনকে একাডেমিক শাস্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠাতাদের বক্তব্য ও যুক্তিসমূহকে মেনে নেওয়া হয়। তার আগে আমরা দেখেছি ১৮৬৪ সালের মার্কিন সরকারের ঘোষণা; এই ঘোষণা অনুসারে সরকারের নারী কর্মচারীরা সম কাজের জন্য পুরুষদের অর্ধেক বেতন পাবে। যদিও বেতন সংক্রান্ত সাম্যের ধারণা পরবর্তীকালে স্বীকৃত হয়েছে, তাহলেও পেশা ও বেতনগত অসাম্যের অসংখ্য উদাহরণ এখনও চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। অনেক পরে ১৯৬৩ সালে মার্কিন সম বেতন আইন এক্ষেত্রে সাম্য সুনিশ্চিত করে। তাহলেও বর্তমান যুগেও নারীপুরুষের সম কাজের জন্য বেতনগত অসাম্যের অস্তিত্ব মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। পুরুষদের ১ ডলার আয়ের অনুপাতে নারীদের আয় হল ৭৭.৪% মাত্র। শিল্পায়ন, বিশ্বায়ন ও বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়াগুলি বিংশশতকের লিঙ্গ অসাম্যকে আরও জোরদার করেছে।

জনপ্রশাসনে লিঙ্গভূমিকা সংক্রান্ত দুটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দেখা যায়—প্রথমটি দক্ষতা ও বিষয়গত দিকগুলির ওপর এবং দ্বিতীয়টি সামাজিক ন্যায়ের দিকগুলির ওপর জোর দেয়। প্রথমটি পুংলিঙ্গবাচক এবং দ্বিতীয়টি স্ত্রীলিঙ্গবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে উভয় দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—নারী ও পুরুষ মিলিতভাবে সরকারি নীতিসমূহের সুদক্ষ রূপায়নের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন জনপ্রশাসনে দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন ঘটে। জনপ্রশাসন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে পুরুষদের আধিপত্যযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে—যেমন, সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের জনপ্রশাসনসংক্রান্ত পরামর্শদান কমিটি (Social Science Research Council's Advisory Committee of Public Administration) জনপ্রশাসন ব্যবস্থার মধ্যে দক্ষতার ওপর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। রকফেলার ফাউন্ডেশন এই সময় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার জন্য দরাজ হাতে অর্থসাহায্য করতে থাকে। পুংলিঙ্গবাচক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের প্রতি মার্কিন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়। ফলে জনপ্রশাসনের ওপরও তার প্রভাব পড়ে। ১৮৯০ সালে অর্থনীতির আলোচনার ধারার পরিবর্তন ঘটে—সাধারণ প্রবণতার বদলে পরিসংখ্যান ও গণিত বা কঠোর বাস্তবতার ওপর গুরুত্ব বৃদ্ধি ঘটে। অন্যদিকে সমাজতত্ত্ব মানবসম্পর্ক সংক্রান্ত বিমূর্ত সামান্যীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশেষ জ্ঞানের ওপর জোর দিতে থাকে এবং সামাজিক ন্যায়ের ধারণাকে উৎসাহ দিতে থাকে।

এই দ্বিবিভাজনের ফলে পরবর্তীকালে নারীরা প্রধানত সমাজসংক্রান্ত বিশেষ কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে আর পুরুষ অর্থনীতি, শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করতে থাকে।

১.৫ মানব মূলধন তত্ত্ব ও সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব

উভয় তত্ত্বই জনপ্রশাসনে ও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অসম প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার ব্যাখ্যা প্রদান করে। মানব মূলধন তত্ত্ব অনুসারে সরকারে নারী ও পুরুষদের স্বতন্ত্র ভূমিকার সৃষ্টি হয় কারণ ঐতিহাসিকভাবে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গবাচক চিন্তাধারাকে স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরোধী হিসাবে বিবেচনা করা হত। এই তত্ত্ব আরও জানায় যে নারীদের লঘু ভূমিকার কারণ হল ব্যক্তিগত মানব মূলধনের ক্ষেত্রে তাদের বিনিয়োগ খুব কম। এই তত্ত্বের সমর্থকরা মনে করতেন যে পুরুষরা সমাজে অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করে, কারণ তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করে এবং তাই উন্নত ধরনের চাকরি জোগাড় করতে পারে। তাদের কাজের অভিজ্ঞতাও অনেক বেশি।

সমাজতত্ত্বের আলোচনায় মানব মূলধন তত্ত্বের সমালোচনার উত্তরে কিছু গবেষক সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। এই তত্ত্বটিও মানব মূলধন তত্ত্বের মতো নারী ও পুরুষের যোগ্যতার পার্থক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু উভয় তত্ত্বের মধ্যে তফাৎ এই যে মানব মূলধন তত্ত্বটি কিছু সমাজতাত্ত্বিক বাধ্যতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেগুলি নারীদের উচ্চতর যোগ্যতা অর্জনকে বাধাদান করে। এই তত্ত্বের আরও বক্তব্য, মানসিকতার দিক থেকে সমাজ পুরুষজাতিকে আক্রমণমূলক, উচ্চাকাঙ্খী ও আত্মবিশ্বাসী প্রকৃতিযুক্ত হিসাবে, অন্যদিকে নারীজাতিকে দয়াপ্রবণ স্নেহপরায়ণ, সংবেদনশীল ও কোমলস্বভাবযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করে থাকে। তাই নিয়োগকর্তারা সমযোগ্যতাসম্পন্ন হলেও পুরুষদের তুলনায় নারীদের 'নিকৃষ্টতর' হিসাবে গণ্য করে। এই তত্ত্বটি অনুসারে পুরুষদের আধিপত্যযুক্ত পেশাগুলিতে নারীদের প্রবেশ সহজ নয়, কারণ সেখানে তাদের হয় অযোগ্য বা পুরুষদের তুলনায় কম যোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

সমাজতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব অনুসারে সমাজে নারীদের স্থান সম্পর্কে দেখা যায় সামাজিকভাবে কিছু সমাজতাত্ত্বিক নির্মাণ ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে নারীদের যোগ্যতাসংক্রান্ত কিছু গতানুগতিক ধাঁধা ধরা ছক। সেগুলি দ্বারা সরকারি কাজের ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিনিধিদের ধরন স্থিরীকৃত হয়। সমাজতাত্ত্বিক নির্মাণ অনুসারে নারীদের এলাকা হল গার্হস্থ্য কাজ, সন্তানের জন্মদান ও সন্তান প্রতিপালন। নারীদের সম্বন্ধে এই সমাজতাত্ত্বিক নির্মাণ এত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত যে তা জনপ্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির অংশযুক্ত হয়ে গেছে। কাজেই নারীদের পেশাগত উন্নতির ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে।

১.৬ জনপ্রশাসনে লিঙ্গবৈচিত্র্যের সুবিধা

জনপ্রশাসন শাস্ত্রটিকে যদি দক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়—উভয় আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হয়, তাহলে জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে উভয় লিঙ্গের যোগ বা লিঙ্গবৈচিত্র্য বিশেষভাবে জরুরী। জনপ্রশাসন শাস্ত্রটি প্রথমে যখন প্রায়োগিক বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন যার মধ্যে দক্ষতা ও কার্যকারিতাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হত। তার ফলে সামাজিক সাম্য, সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ ও সুযোগের সাম্য-সংক্রান্ত নীতিসমূহকে কম গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু এখন সরকারি ক্ষেত্রে নারীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বকে মেনে নেওয়া হয়, যার পিছনে মৌলিক যুক্তি হল যে, সরকারি ক্ষেত্রে যদি সামাজিক সংগঠনের লিঙ্গবৈচিত্র্যের যথার্থ প্রতিফলন হয়, তাহলে সরকার অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ও সংবেদনশীল হয়। অর্থাৎ সর্বব্যাপী বিকাশ ও গণতান্ত্রিক শাসন সুনিশ্চিত করার

জন্য জনপ্রশাসনে উভয় লিঙ্গের উপস্থিতি বা লিঙ্গ বৈচিত্র্যের প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা থাকলে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস ফিরে আসে, স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয় এবং গণনীতির প্রতি জনগণের সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। এগুলি হল উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল সব ধরনের দেশের গণনীতিরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ। জনপ্রশাসন ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের পুরুষদের সমান অংশগ্রহণ থাকলে তবেই নারীস্বার্থসংক্রান্ত সমস্যাসমূহ পূর্ণভাবে বিবেচিত হয় এবং সেগুলির সঠিক সুরাহা সম্ভব হয়।

১.৭ লিঙ্গ ও জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ইউ.এন.ডি.পি. (U.N.D.P) ও অন্যান্য প্রতিবেদন

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউ.এন.ডি.পি.) একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে জাতীয় উন্নয়নের জন্য জনপ্রশাসনের গুরুত্বকে স্বীকার করে এবং জনপ্রশাসনে উভয় লিঙ্গের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ করে। সংস্থাটি সরকারি কাজের সামর্থ্য বৃদ্ধি ও দক্ষতা সুদৃঢ়করণের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে কারিগরি ও কৌশলগত সহায়তা প্রদান করে, মহিলা সরকারি পরিচালক ও কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করে এবং নতুন প্রগতিমূলক ধারণার প্রবর্তন, পুরনো প্রথাসমূহের সংস্কার, মানবসম্পদের বিকাশ ও আন্তঃমন্ত্রী স্তরে সহযোগিতার ব্যবস্থা করে।

জনপ্রশাসনে লিঙ্গ বিষয়টির বিভিন্ন ধরন বিশ্লেষণ করে সংস্থাটি ২০১৪ সালে নিম্নলিখিত সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলি উল্লেখ আছে—

(১) ইউ. এন. ডি. পি. তথ্য অনুসারে **প্রায় সব দেশেই জনপ্রশাসনের উচ্চতম স্তরগুলিতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব নেই।** এই সংস্থার মতে কয়েকটি দেশে মহিলাদের উন্নয়ন ঘটেছে দ্রুতহারে—কোস্টারিকায় ৪৬%, বৎসোয়ানায় ৪৫% ও কলম্বিয়ায় ৪০%। কিন্তু মহিলাদের নিম্নতর পদে চাকরি এবং সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভ্রমণব্যবস্থা ইত্যাদি কয়েকটি লঘু ক্ষেত্রে নিয়োগ হল সাধারণভাবে সব দেশেরই স্থায়ী প্রবণতা।

(২) **পেশা বিভাজন ক্ষেত্রে লিঙ্গ পক্ষপাত প্রবল।** নারীরা প্রধানত সহায়তা কর্মী বা লঘু পেশায় নিযুক্ত হয়, আর পুরুষরা যুক্ত থাকে সিদ্ধান্তগ্রহণ, পরিচালনা ইত্যাদি সংক্রান্ত উচ্চ পদে।

(৩) নারীরা প্রধানত **স্বল্পস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়,** স্থায়ী চাকরিতে নয়।

(৪) স্থানীয় সরকারে মহিলাদের নিয়োগ ঘটে অনেক বেশি। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্তরের নিচের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে কাউন্সিল সদস্য বা কাউন্সিল কর্মী হিসাবে মহিলাদের দেখা যায়, কিন্তু সেখানকার **শাসনবিভাগীয় কার্যনির্বাহী সংস্থার মেয়র বা উচ্চপদে তাদের প্রবেশ কম,** কারণ তা পুরুষদের এক্তিয়ারের বিষয় বলে পরিগণিত হয়।

(৫) রাজনীতি ক্ষেত্রে মহিলাদের **কিছুটা সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে, তবে সেই সংখ্যা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়।** ২০০৫ সালে নির্বাচিত মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের সংখ্যা ছিল ৮, ২০১২ সালে তা বেড়ে হয় ১৭; নারী মন্ত্রীদের অনুপাত ২০০৫-এ ছিল ১২.২% আর ২০১২ সালে তা হয় ১৬.৭%। রাজনীতিতে নারীদের সর্বোচ্চ সংখ্যা দেখা যায় স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে।

(৬) **বেসরকারি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ স্তরের উচ্চপদে মহিলাদের অংশগ্রহণ এক-তৃতীয়াংশের কম** দেখা গেছে এবং দশজন পুরুষের অনুপাতে একজন মাত্র মহিলার বোর্ডরুমের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল।

(৭) **সম উচ্চপদ অর্জনের জন্য পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের উচ্চতর যোগ্যতার প্রয়োজন হয়।** ১৯৭৯ ¢yöœ ¢!Á¿œ" þ‹ y" þTØ ¢î î µþ ÷ ¡ öi Äûx î ¢yöï î ûk ˜Ä„ þö þŸ˜ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination বা CEDAW) এর প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। সেগুলি হল—নারী পাচার রোধ, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি, বলপূর্বক বিবাহ ও বাল্যবিবাহের অবসান, প্রকট লিঙ্গ ও অন্যান্য বৈষম্যের অপসারণ, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অধিকারের সুনিশ্চিতকরণ, ভোটাধিকার প্রদান, মায়েদের সহায়তা, চাকরি ও ব্যবসাসংক্রান্ত অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি। এগুলির মাধ্যমে (CEDAW) চেয়েছিল নারী পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অসাম্যের প্রতিকার। (CEDAW)-এর মতে লিঙ্গবৈষম্য বলতে লিঙ্গের ভিত্তিতে যেকোন রকম ব্যতিক্রম, সীমাবদ্ধতা ও পৃথকীকরণকে বোঝায়; এই লিঙ্গবৈষম্যের উদ্দেশ্য হল বৈবাহিক অবস্থান নির্বিশেষে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে নারীদের মানবাধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিগত, পৌর বা অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি, ভোগ ও ব্যবহারকে সীমিত বা নাকচ করা।

বাসিলিয়া ঐক্যমত দলিল, ২০১০ (Brasilia Consensus Document, 2010) সালে ৩৩টি ল্যাটিন আমেরিকান ও ক্যারিবীয় দেশ দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। এই দলিলটি এই দেশগুলির সরকারদের নারীদের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য উজ্জীবিত করে।

১৮৯ দেশ দ্বারা স্বীকৃত বেজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন, ১৯৯৫ (Bejing Platform for Action, 1995)-এ আছে সব রকম জনপ্রশাসন ও সরকারি কাজে নারীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারের অঙ্গীকার।

সাউথ আফ্রিকার উন্নয়ন পর্ষৎ (South African Development Council or SADC)-এর লিঙ্গ ও প্রোটোকল (Gender and Protocol) ২০০৮ সালে ঐক্যবদ্ধভাবে ঘোষণা করে যে দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত পদগুলির (সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র মিলিয়ে) ৫০% মহিলাদের দ্বারা অধিকৃত হবে।

মানবাধিকারের ঘোষণার ২১নং ধারায় আছে—(১) প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে বা স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে তার দেশের সরকারি কাজে যোগ দেওয়ার অধিকার ভোগ করে।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তি তার দেশের সরকারি কাজে যোগদানের সমসুযোগ ও ক্ষমতা ভোগ করে।

১.৮ নারী ও জনপ্রশাসন—সামাজিক-সংস্কৃতিগত বাস্তবতা

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই লিঙ্গবৈষম্য দেখা যায়—অবশ্যই বিভিন্ন মাত্রায়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাঁধাধরা ও গতানুগতিক কিছু ছক এবং কিছু মিথ্যা বিশ্বাস ও ধারণা এই লিঙ্গবৈষম্যের জন্য দায়ী। কোথাও কোথাও লিঙ্গ বিবেচনা প্রকাশ্যভাবে প্রতীয়মান হয়, জনপ্রশাসন সংক্রান্ত কিছু কিছু বিধি বা ব্যবস্থায় নারীদের প্রতি অসংবেদনশীল ভাষার ব্যবহার থাকে এবং জনপ্রশাসনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কর্মকর্তাদের পুরুষ সংস্থা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। কোথাও কোথাও বিধি, নিয়ম, নীতি বা কর্মসূচিগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ হলেও নারীদের পক্ষে সেগুলি অসুবিধাজনক

বা অস্বস্তিকর, কারণ সেগুলি হয় নারীদের জৈবিক বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্যসমূহকে গুরুত্ব দান করে না, যেমন নারীদের গর্ভাবস্থা বা শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয় না বা লিঙ্গসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রত্যাশা সংক্রান্ত পার্থক্যকে বিবেচনা করে না। ফলে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ কিছু নীতি বা বিধি জনপ্রশাসনে নারীবিরোধি অবস্থান-যুক্ত হয়ে পড়ে। লিঙ্গ সাম্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি বা নিয়মগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলেও কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। অনেক দেশের জাতীয় শ্রম আইন মাতৃকালীন ছুটির জন্য বেতনব্যবস্থা অব্যাহত রাখে এবং যৌন হয়রানির সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু কোথাও কোথাও জনপালনকৃত্যকদের জন্য সেগুলি থাকে না।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিধিনিয়মগুলি লিঙ্গভূমিকাকে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। প্রায়শই বিধিনিয়মগুলি লিঙ্গভিত্তিক ধারণাসমূহের নেতিবাচক অর্থ নির্মাণ করে। অনেক দেশেই বাড়তি দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহী, পূর্ণ সময়ের জন্য কর্মসংস্থানে নিযুক্ত এবং অব্যাহতভাবে কর্মজীবনে যুক্ত নারীদের আক্রমণাত্মক ও পুরুষালি বলে চিহ্নিত করা হয়। এই চিন্তাধারার জন্য অনেক মহিলাই আংশিক সময়ের চাকরি নেন। আংশিক সময়ের চাকরির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও উন্নতির সুযোগ কম থাকে।

অনেক পুরুষ কর্মচারী নারী কর্মচারীদের গুরুত্বহীন বলে গণ্য করেন, অনেকে নারী কর্মচারীদের পুরুষ কর্মচারীদের থেকে নিষ্কৃতির বলে গণ্য করেন। অনেক পুরুষ আবার নারী কর্মচারীদের বিদ্রুপের দৃষ্টিতে দেখেন।

অনেক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা সংস্কৃতি যৌন নির্যাতনকে দন্ডনীয় বলে ঘোষণা করে না। সেইসব ক্ষেত্রের জনপ্রশাসনে যুক্ত নারীদের আত্মবিশ্বাস বিঘ্নিত হয়। কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের ঘটনা নারীদের অনেক সময়ই হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়। অনেকে কিভাবে এই ঘটনার রিপোর্ট করা যায়, সে সম্বন্ধে অজ্ঞ, অনেকে আবার তা রিপোর্ট করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেন। অনেক দেশেই কর্মক্ষেত্রে মহিলা নির্যাতন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে অপরাধীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেই শাস্তির বাস্তবায়ন ঠিকমতো হয় না।

নারীরা ব্যক্তিগত গার্হস্থ্য জীবন ও কর্মক্ষেত্র উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে বাধ্য হয়। ফলে জনপ্রশাসনে পুরুষদের মত সমঅংশগ্রহণ তাদের ক্ষেত্রে কঠিন হয়। কাজে দীর্ঘসময় থাকা বা চুক্তিবন্ধ সময়ের থেকে বেশি ঘণ্টা ধরে কাজ করে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকে অনেক কাজের পুংলিঙ্গবাচক মডেল বলে গণ্য করেন। দীর্ঘসময় ধরে কাজ বা কাজের পর অতিরিক্ত সময় থেকে প্রতিষ্ঠানের প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শনের ফলে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু অনেক আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে সেটাই হল রেওয়াজ। নারীদের পক্ষে দীর্ঘ সময় কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা অসুবিধাজনক, কারণ তাদের ওপর পারিবারিক দায়দায়িত্বের চাপ থাকে। পুরুষদের থেকে নারীদের ওপর সময়-চাপ অনেক বেশি। ফলে নারীরা খুব উচ্চ লক্ষ্য অনুসরণ থেকে অনেক ক্ষেত্রেই নিরস্ত হতে বাধ্য হয়। অনেক নারী আবার মাতৃত্ব লাভের পর কর্মক্ষেত্র থেকে ইস্তফা প্রদান করে।

শিশুদের যত্ন নেওয়ার জন্য পরিকাঠামোর অভাব অনেক সমাজেই সমস্যার সৃষ্টি করে। এজাতীয় পরিকাঠামো থাকলে জনপ্রশাসনে কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে নারীরা ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে এবং জনপ্রশাসনও লাভবান হবে।

এই সমস্ত বিষয়গুলির ভিত্তিতে নারী কর্মীদের সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত সমাধানগুলি গুরুত্বপূর্ণ—

(ক) নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই নমনীয় কাজের সময় থাকা প্রয়োজন।

(খ) কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উভয়কেই বৃহত্তর দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

(গ) যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিধান ও তাদের সঠিক বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(ঘ) কর্মস্থলের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।

(ঙ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতানুগতিক নারীবিরোধী ধারণাসমূহের দূরীকরণ করতে হবে এবং

(চ) নারীদের সরকারি কাজের সময়ে শিশু তত্ত্বাবধান কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৯ বিশ্বায়ন—সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ

জনপ্রশাসন এখন আর জাতীয় সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়। বিংশ শতকের শেষ থেকে বিশ্ববাজার একটি নতুন যুগের অভিমুখে চলেছে, যার বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বব্যাপী সংযুক্ত অর্থনীতি, যেখানে উৎপাদন, ভোগ ও সামাজিক সম্পর্কের অন্যান্য দিকগুলি বহুজাতিক মাত্রাযুক্ত বা বিশ্বায়নের অংশ। বিশ্বায়নের শক্তিসমূহ বাস্তব এবং সর্বত্র তাদের প্রভাবসমূহ অনুভূত হয়। বিশ্বায়নের ফল হিসাবে এসেছে মুক্ত বাজার, মুক্ত চিন্তাধারা ও মূলধনের মুক্ত চলাফেরা, পণ্যদ্রব্যের বিস্তার, ভোগের নতুন ধরন, প্রযুক্তি ও তথ্যের বৈচিত্র্য। ফলে সরকারি নীতি-পদ্ধতিগুলি ব্যবসা এবং আর্থিক বিনিয়োগ প্রবাহের ক্ষেত্রে সরলতা ও উন্মুক্ততা, শিল্পক্ষেত্রে লঘু নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগ ও শিল্পসমূহের বেসরকারিকরণ ইত্যাদির দিকে ঝোঁকে। উদারনীতিবাদ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক সংযুক্তিকরণকে ত্বরান্বিত করে এবং জাতি-রাষ্ট্রের সাবেকি সীমানাকে ম্লান করে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে সরকার নানাবিধ বিনিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু সামাজিক সুরক্ষার জন্য নতুন ধরনের কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে না। ফলে অনেক সামাজিক গোষ্ঠীগুলি বিশ্বায়নজনিত ঝুঁকি ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ইউ.এন.সি.টি.এ.ডি (UNCTAD)-এর ব্যবসা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন (Trade and Development Report)-এ এবং ইউ.এন.ডি.পি.-র মানবিক উন্নয়ন প্রতিবেদনে (UNDP Human Development Report), ১৯৯৭ ও ১৯৯৯ বলা হয় যে সাম্প্রতিক উদারীকরণ নীতির ফলে সংগঠিত অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অসাম্য বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটতে পারে। এশিয়ার সংকটকালীন অবস্থায় দেখা গেছে যে অর্থনৈতিক বাজারের ব্যর্থতা সব দেশের অর্থনীতিতে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। বিশ্বায়নজনিত আন্তর্জাতিক সংহতি ও সংযুক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির প্রভাবও অপরিসীম। বিশ্বের জনগণ অর্থনৈতিক আদানপ্রদান এবং বিজ্ঞাপন, প্রচারমাধ্যম ও টেলিযোগাযোগ দ্বারা বস্তুগত ভোগের মাধ্যমে পরিতৃপ্তির সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। বিশ্বায়ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত এবং পরিচয়ের রাজনীতি, বহুজাতিক হয় সমাজ, শাসনব্যবস্থার নতুন ধরন, সার্বজনীন মানবাধিকার ইত্যাদি নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন করছে।

বিশ্বায়নের ভাল ও খারাপ দুটি দিকই দেখা যায়। বিশ্বায়ন নানা সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আসে, যেমন বৃহৎ বাজার সৃষ্টি বা বৃহৎ বাজারে যুক্ত হওয়া, প্রযুক্তি হস্তান্তর ইত্যাদি কিন্তু বিশ্বায়নের সঙ্গী হল বিপদ ও ঝুঁকি, অস্থায়িত্ব এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। বিদেশি বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফলে অনুন্নত বা উন্নয়নমূলক দেশের অর্থনীতির আধুনিকীকরণ, দক্ষতাবৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে। ফলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। বিশ্বায়ন আবার শ্রমিকদের জীবিকার ধ্বংসসাধন করতে পারে, দেশের শিল্প ও ব্যাংকের ক্ষতি ঘটাতে পারে এবং সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিতে পারে।

১.১০ বিশ্বায়ন ও নারী

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে লিঙ্গসাম্যের প্রশ্ন বিশেষভাবে যুক্ত। বেজিং +৫ কর্মশালা (১৯৯৯) (Bejing +5 Workshop, 1999) লিঙ্গ সম্পর্ক রূপান্তরের ক্ষেত্রের বিশ্বায়নের গুরুত্বকে স্বীকার করে। এই কর্মশালায় বলা হয় যে বিশ্বের সর্বত্রই লিঙ্গ অসাম্য ও লিঙ্গভিত্তিক ভেদাভেদ থাকার জন্য নারীরা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা পুরুষদের তুলনায় অধিক পরিমাণে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। তাদের আবার কিছু লাভও হয়। এই প্রসঙ্গে গুরুত্ববহ কিছু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের আলোচনা করা হল—

(ক) শ্রম বাজার

বিশ্বায়নের ফলে শ্রমবাজারের সম্প্রসারণ ঘটে, যার কিছু ইতিবাচক প্রভাব আছে। বিশ্বায়নের ফলে অ-পরম্পরাগত (non-traditional) ক্ষেত্রে নারীদের জন্য চাকরির কিছু সুযোগ বৃদ্ধি পায়। তার ফলে নারীদের আয়বৃদ্ধি ঘটে, যা পরিবারের মধ্যে ও সমাজের মধ্যে নারীদের ক্ষমতায়ন ঘটায় এবং তাদের ভূমিকা ও মর্যাদা সংক্রান্ত আপোষ মীমাংসার সামর্থ্য বৃদ্ধি করে।

গত দু দশকে উন্নত বাজার অর্থনীতির শ্রমশক্তিপ্রধান শিল্পগুলি মধ্য আয় উৎপাদনকারী উন্নয়নমূলক দেশগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে শেষোক্ত দেশগুলির নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বায়ন আবার শোষণের মাত্রার ঊর্ধ্বগতি এবং বাজারের ওপর প্রত্যক্ষ নির্ভরতা বৃদ্ধি ও বাজারের খামখেয়ালের প্রবণতা বৃদ্ধি করেছে। দেখে গেছে যে নারীদের চাকরির সুযোগ প্রধানত কম দক্ষতাযুক্ত ক্ষেত্রে সীমিত হয়েছে এবং নারী-পুরুষের পারিশ্রমিকের পার্থক্য থেকে গেছে। তাহলেও নারী শ্রমিকের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নারীদের কিছু কল্যাণ ঘটেছে এবং তার ফলে তাদের পরিবারগুলির ওপর বিশ্বায়নের যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। তবে যে দুরবস্থাজনক পরিকাঠামোর মধ্যে অনেক নারী শ্রমবাজারে প্রবেশ করে বা করতে বাধ্য হয়, তার প্রতিকার প্রয়োজন।

সস্তায় শ্রমিক নিয়োগ ও উৎপাদনের সুবিধার জন্য উন্নত দেশগুলির শ্রমিক চাহিদা ও উৎপাদনপ্রক্রিয়া অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্থানান্তরিত হচ্ছে। ফলে উন্নত দেশগুলির শ্রমিক চাহিদা উচ্চ দক্ষতাযুক্ত উৎপাদন শিল্পে বেশি হচ্ছে, আর সেখানে নিম্ন দক্ষতাযুক্ত ক্ষেত্র, যেখানে নারীদের প্রাধান্য বেশি, সেগুলির সাধারণ শ্রমিক চাহিদা কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাধারণ শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(খ) সেবাসংক্রান্ত বাণিজ্য

বাণিজ্য হল শিল্পায়ন ও বিশ্বায়নের সুফল প্রাপ্তির অন্যতম মাধ্যম। চাকরি বা কর্মক্ষেত্র, উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ধরণ, সংস্কৃতিগত মূল্যবোধ, সামাজিক সম্পর্ক, পরিবেশ ইত্যাদিকে বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিসমূহ প্রভাবিত করে। সেগুলি আবার নারী ও পুরুষ উভয়কেই নানাভাবে প্রভাবিত করে। বিশ্ববাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন কাজ ও পেশার সঙ্গে বিশেষত সেবামূলক ক্ষেত্রের সঙ্গে নারীদের সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সেবামূলক ও পেশাগত ক্ষেত্র, যেমন আইন, ব্যাঙ্ক, হিসাবসংরক্ষণ, কম্পিউটারভিত্তিক কাজ, পর্যটন শিল্প, তথ্যসেবা, ডাক ব্যবসা, ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থা, টেলিফোন অপারেটিং, প্রকাশকদের জন্য শব্দ প্রক্রিয়াকরণ (word processing), বিমান বুকিং

ইত্যাদির কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান, ওষুধ ও সার্জারী ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সব দেশেই, বিশেষত উন্নত দেশগুলিতে বয়স্ক লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। তাছাড়াও বিশ্বায়নের ফলে রাষ্ট্রীয় কল্যাণকর ও সেবামূলক কাজ অনেক কমে গেছে। ফলে অনুন্নত বা দরিদ্র দেশ থেকে শুশ্রূষাকারী বা নার্স হিসাবে মহিলা শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(গ) শাসন প্রক্রিয়া

বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতির সংযুক্তির ফলে সরকারি নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের কেন্দ্র জাতীয় স্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে স্থানান্তরিত হয়েছে। শাসনপ্রক্রিয়ার কেন্দ্র পরিবর্তনের এই ক্রমবর্দ্ধমান প্রবণতার ফলে নাগরিকতাসংক্রান্ত প্রচলিত ধারণা দুর্বলতর হয়ে পড়ছে। বহুকাল ধরেই নারী আন্দোলনগুলির মধ্যে পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার অর্জনের দাবিগুলি এবং সামাজিক পরিচিতিসংক্রান্ত বক্তব্যসমূহ সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রকে ঘিরেই পরিচালিত হত। এখন নতুন একক হিসাবে জাতি, রাষ্ট্রের ঊর্দ্ধস্থ বিশ্ব একক এবং নিম্নস্থ স্থানীয় একক গুরুত্ব লাভ করেছে। এগুলি নারীদের জন্য বিকল্প পরিচিতি ও ভূমিকা দাবি করে। ফলে নারীদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে।

বিশ্বায়নের ফলে এক অভূতপূর্ব বোঝাপড়ার সৃষ্টি হয়েছে—অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণার অংশ হয়ে পড়েছে। তাছাড়াও আন্তঃসরকারি প্রক্রিয়াগুলির ওপর আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব দেখা যাচ্ছে। ফলে একদিকে নারীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক নারী সংস্থাগুলি জাতীয় ও স্থানীয় স্তরে জায়গা করে নিচ্ছে।

(ঘ) দারিদ্র্য

শিল্পায়ন ও বিশ্বায়নের ফলে রাষ্ট্রীয় সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, মানব মূলধন সংক্রান্ত বিনিয়োগ বা মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজের ক্ষেত্র হ্রাস পেয়েছে। তার ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি, সমাজের দুর্বল অংশ, বিশেষত নারী ও শিশুদের প্রয়োজন পূর্ণ করা বা তাদের জন্য ন্যূনতম সেবামূলক ব্যবস্থা বা তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। আধুনিককালে কল্যাণকর রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ও বেসরকারি সামাজিক সেবামূলক কাজের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির ফলে উন্নত, অনুন্নত বা উন্নয়নশীল সব দেশের মহিলাদের জীবনযাত্রার ওপর নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেক পরিবারেই অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হচ্ছে। পারিবারিক আর্থিক বোঝা মেটানোর জন্য নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে ও গৃহের বাইরে কাজ করতে বের হচ্ছে এবং গৃহপরিচালনার সঙ্গে বাইরের চাকরির সমন্বয় করতে বাধ্য হচ্ছে। শিশুশ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটছে একই কারণে।

(ঙ) দেশান্তরগমন (Migration)

বিশ্বায়নের আধুনিক প্রবণতার ফলে শ্রমের আন্তঃসীমান্ত প্রবাহের ধরন এবং শ্রমিকের চাহিদার ধরন পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশ্বায়ন স্বল্পস্থায়ী ও সাময়িক কর্মসংস্থানের পক্ষপাতী। তাই বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পস্থায়ী চুক্তিবন্ধ শ্রমিক পরিযান বৃদ্ধি পাচ্ছে যার মধ্যে দেখা যাচ্ছে লিঙ্গ পার্থক্যের সুস্পষ্ট প্রবণতা। নারীরা বেশি সংখ্যায় বড় বড় শহরে যাত্রা করছে এবং নতুন নতুন কাজের জন্য শ্রমচুক্তিতে আবন্ধ হচ্ছে। পরিযানের ফলে তাদের জীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাচ্ছে, কিন্তু বিশ্বের কোন কোন অংশে পরিযায়ী মহিলারা পাচার ও যৌন

নির্যাতনের শিকারে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু জাতীয় সীমানা পারাপারকারী শ্রমিক অধিকার রক্ষার জন্য কার্যকর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অভাবহেতু বৈধ ও অবৈধ উভয় ধরনের পরিযায়ী নারীরাই পুরুষদের দ্বারা নির্যাতনের বস্তুতে পরিণত হচ্ছে।

(চ) প্রযুক্তিগত পরিবর্তন

আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্তৃতি ও প্রসারণের ফলে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা ইন্টারনেট, ইমেল, নেটওয়ার্কিং, তথ্যের আদানপ্রদান ও প্রচার, স্থানীয় কারিগর ও উৎপাদকের পণ্যসমূহ বিশ্বব্যাপী বাজারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সৃষ্ট সৃজনশীল ইকমার্স ইত্যাদি উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নারী ও পুরুষ ইন্টারনেটের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকছে। এগুলি প্রশিক্ষণের জন্য খরচ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবস্থান ও সময়গত সীমাবদ্ধতা তাদের সামনে বাধার সৃষ্টি করছে। আধুনিক সমাজে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কাজ, বিশেষত পরিসেবামূলক কাজ উন্নয়নশীল দেশের পুরুষ ও নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের অভিনব সুযোগ সৃষ্টি করেছে। গৃহভিত্তিক টেলিকম কাজ, টেলিসেন্টারে কাজ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজের সময়, অবস্থান ইত্যাদি ব্যাপারে নমনীয়তার সুযোগ আছে। ফলে এইসব কাজে যুক্ত হলে নারীরা তাদের গার্হস্থ্য সীমাবদ্ধতা কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারে। বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সংখ্যায় নারীদের কর্মী হিসাবে যোগদান এবং নারীদের রাজনৈতিক সমাবেশ, সংহতি ও বিভিন্ন ধরনের নারীসংস্থাসমূহের সম্প্রসারণ একই সময়ে হয়েছে। সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women বা CEDAW) এবং বেজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন (Bejing Platform for Action) নারীদের এই ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির বোধকে স্বীকার করেছে। উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা সংক্রান্ত বিশ্ব সার্ভে (World Survey on the Role of Women in Development) মন্তব্য করে যে জাতীয় অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে অবিরত সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হবে, নতুবা বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করা যাবে না। বেজিং +৫ প্রক্রিয়া (Bejing +5 process) মনে করে যে লিঙ্গ সাম্য বিকাশের প্রবক্তাদের এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে শান্তিকামীদের সমান চ্যালেঞ্জ হল নতুন ধরনের মৈত্রীবন্ধন প্রতিষ্ঠা এবং সর্বব্যাপী উন্নয়ন ও সামগ্রিক বিশ্বসমাজ গঠনের নতুন ধরনের বিধিনিয়মের বিকাশ ঘটানো।

২০০৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জেনারেল সেক্রেটারী নারীদের বিরুদ্ধে হিংসা বন্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধতা প্রচারকার্য (Unite to End Violence against Women Campaign) এর সূচনা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের সর্বত্র নারী ও বালিকাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের হিংসার প্রতিরোধ ও যাবতীয় বৈষম্যের অবলুপ্তির জন্য গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং এজন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সম্পদ বৃদ্ধি। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরে প্রচারের মাধ্যমে এই উদ্যোগ বিভিন্ন ব্যক্তি ও জনসমাজ, বিভিন্ন নারী সংগঠন ও সুশীল সমাজগোষ্ঠী, পুরুষসমাজ, যুব গোষ্ঠী, বিখ্যাত ব্যক্তি, শিল্পী, ক্রীড়াবিদ, বেসরকারি ক্ষেত্র—সকলকে একত্রিত করে এই উদ্দেশ্য অর্জন করার ওপর তিনি জোর দেন।

জনপ্রশাসনে লিঙ্গ সাম্যসংক্রান্ত ইউ.এন.ডি.পি.-র বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ (UNDP Global Initiative on Gender Equality in Public Administration বা GEPA), ২০১৪ নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দান করে—

(১) নারীর ক্ষমতায়ন এবং রাষ্ট্রের শাসনবিভাগে নারীদের ক্রমবর্দ্ধমান অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি,

(২) জনপ্রশাসনে লিঙ্গ সাম্যসংক্রান্ত সাম্প্রতিক তথ্যের সহজলভ্যতা,

(৩) কেসস্টাডির জন্য ১৩টি দেশকে গুরুত্ব দান—বাংলাদেশ, বৎসোয়ানা, বুরুন্ডি, কম্বোডিয়া, কলম্বিয়া, জর্ডন, কিরঘিজস্থান, মালি, মরক্কো, মেক্সিকো, রুমানিয়া, সোমানিয়া ও উগান্ডা।

আমরা আগেই দেখেছি যে উন্নয়নশীল দেশগুলি অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্তর্মুখী রাষ্ট্র নির্দেশিত অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থা থেকে বহির্মুখী মুক্ত বাজার, উদারনীতিকরণ ও বিশ্বায়নের খোলামেলা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে যাত্রা করে, যা অল্প কিছু সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে সকলের জন্য নানা অসুবিধা সৃষ্টি করে, বিশেষত নারীদের জন্য।

ভারতীয় অর্থনীতির ঋণ সংকটকালে ভারত সরকার ১৯৯১ সালে মুক্ত অর্থনৈতিক নীতি চালু করে, যা ছিল IMF দ্বারা নির্দেশিত কাঠামোগত নীতির (Structural Adjustment Policy) অপরিহার্য অঙ্গ। এজন্য IMF যথেষ্ট পরিমাণ ঋণ প্রদান করে। এই নীতিই ভারতে ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন নীতির সূচনা করে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ নীতি অস্বীকার করে এবং অর্থনীতিতে বাজারীকরণের ব্যবস্থা করে। এগুলির ফলে একদিকে প্রযুক্তিগত উন্নতি, শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণ ঘটলেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে অসাম্য বৃদ্ধি ঘটেছে, নারীপুরুষের অসাম্য বেড়ে গেছে এবং দারিদ্র্যের মহিলাকরণ (feminisation of poverty) ঘটেছে।

১.১১ সরকারি অফিসে লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিরোধ বা তার সমাপ্তিসংক্রান্ত আইনসমূহ (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক)

সরকারি অফিসে লিঙ্গবৈষম্য হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন আইনের সংখ্যা বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক পটভূমিতে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এজাতীয় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কিছু আইন হল—

(১) এমপ্লয়মেন্ট নন-ডিসক্রিমিনেশন অ্যাক্ট (Employment Non-discrimination Act) (আমেরিকা)—এই আইনটি যে কোন ধরনের বৈষম্যকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

(২) দ্য সিভিল রাইটস অ্যাক্ট (The Civil Rights Act), ১৯৬৪ (আমেরিকা)—এই আইনটি যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে জাতি, গায়ের রং, ধর্ম, জাতীয় পরিচয় বা লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যকে বেআইনী ঘোষণা করে।

(৩) হাউস্টন ইক্যুয়াল রাইট্স্ অর্ডিন্যান্স (Houston Equal Rights Ordinance)—এই অর্ডিন্যান্সটি লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, জাতীয় পরিচয়, বয়স ধর্ম, বিকলাঙ্গতা, গর্ভাবস্থা, জেনেটিক তথ্য এবং পরিবার, বৈবাহিক বা সামরিক মর্যাদার ভিত্তিতে অসাম্যকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

(৪) সম বেতন আইন (Equal Pay Act), ১৯৬৩ (আমেরিকা)—এই আইনটি সম কাজের জন্য সম বেতনের কথা বলে।

(৫) ফেয়ার এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্ট (Fair Employment Act), ১৯৪১ (আমেরিকা) এই আইনটি চাকরিক্ষেত্রে সাম্যনীতিকে জোর দেয়।

(৬) এমপ্লয়মেন্ট ইকুইটি অ্যাক্ট (Employment Equity Act), ১৯৯৮ (সাউথ আফ্রিকা) এই আইনটিও চাকরিক্ষেত্রে সাম্যের ওপর জোর দেয়।

(৭) প্রভিশন অফ ইকুয়ালিটি অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ ডিসক্রিমিনেশন অ্যাক্ট (Provision of Equality and Prevention of Discrimination Act), ২০০০ (সাউথ আফ্রিকা)।

(৮) সাউথ আফ্রিকার সংবিধানের ৯নং অধ্যায়।

(৯) ইক্যুয়াল পে অ্যাক্ট (Equal Pay Act), ১৯৭০ (ব্রিটেন)।

(১০) ইকুয়ালিটি অ্যাক্টস্ (Equality Acts), ২০০৬ ও ২০১০ (ব্রিটেন)।

(১১) এমপ্লয়মেন্ট ইকুয়ালিটি রেগুলেশনস্ (Employment Equality Regulations), (ব্রিটেন)।

(১২) ভারতীয় সংবিধানের ১৪নং ধারা।

(১৩) জাতিগত অক্ষমতা দূরীকরণ আইন (Caste Disabilities Removal Act), ১৮৫০ (ভারতবর্ষ)।

(১৪) হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (Hindu Succession Act), ১৯৫৬ (ভারতবর্ষ)।

(১৫) তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি (নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ আইন) (The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities Act), ১৯৮৯ (ভারতবর্ষ)।

(১৬) ক্যানাডিয়ান এমপ্লয়মেন্ট ইক্যুইটি অ্যাক্ট (Canadian Employment Equity Act), ১৯৮৬।

(১৭) ক্যানাডিয়ান হিউম্যান রাইটস্ অ্যাক্ট (Canadian Human Rights Act), ১৯৭৭।

(১৮) এমপ্লয়মেন্ট ইকুয়াল অপরচ্যুনিটি ল (Employment Equal Opportunity law), ১৯৮৮ (ইস্রায়েল)।

(১৯) সমবেতন কনভেনশন (Equal Remuneration Convention), ১৯৫১ (আন্তর্জাতিক)।

(২০) বৈষম্য (কর্মসংস্থান ও পেশা) কনভেনশন (Discrimination (Employment and Occupation) Convention), ১৯৫৮ (আন্তর্জাতিক)।

(২১) কনভেনশন অন দি এলিমিনেশন অফ অল ফর্মস অফ ডিসক্রিশনস্ এগেনস্ট উইমেন (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against women), ১৯৬৫ (আন্তর্জাতিক)।

(২২) মাইগ্রেশনস্ ইন অ্যাবিউসিভ কনডিশন্স্ অ্যান্ড দ্য প্রোমোশন অফ ইক্যুয়ালিটি অফ অপরচ্যুনিটি অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অ্যাক্ট অফ মাইগ্র্যান্ট ওয়ারকার্স (Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment Act of Migrant Workers), ১৯৭৫ (আন্তর্জাতিক)।

১.১২ জনপ্রশাসনে প্রান্তিক লিঙ্গ পরিচয় সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কেসস্টাডি

গবেষকরা ১৫৫টি স্পনীয় মিউনিসিপ্যালিটির ওপর অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে জনপ্রশাসনের অধিকাংশ বিভাগই মূলত পুরুষ ব্যক্তিদের পছন্দ করে। গবেষণার এলাকাগুলির মধ্যে ১৪টিতে লিঙ্গগত পার্থক্য ছিল ১০% এবং দুটিতে লিঙ্গ পার্থক্য ছিল ৫০% এর বেশি। যেসব এলাকায় কিছুটা সাম্য দেখা গেছে, সেখানেও পুরুষরা ব্যবস্থার উচ্চস্তরে আধিপত্য করত—মেয়র বা সমজাতীয় পদে পুরুষদের সংখ্যা বেশি ছিল; আর নারীরা ছিল প্রধানত পরিষদের সাধারণ কাজে। অর্থনীতি ও অর্থসংক্রান্ত ক্ষেত্রে দেখা গেছে পুরুষপ্রাধান্য, নারীরা ছিল প্রধানত সামাজিক ন্যায়সংক্রান্ত ক্ষেত্রে। গবেষণার উপসংহারে বলা হয়েছে যে নারীরা অধিক পরিমাণে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হলেও পুরুষপ্রাধান্য যুক্ত ও পুরুষালি ব্যবস্থার মধ্যে তারা প্রধানত মেয়েলি কাজের মধ্যেই সীমিত থাকতে বাধ্য হয়।

১.১৩ বৃহত্তর লিঙ্গ সমতার জন্য একটি চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

জনপ্রশাসনের লিথুয়ানিয়ান ইনস্টিটিউট (Lithuanian Institute of Public Administration) সম সুযোগ সংক্রান্ত ওম্বুড্সম্যান অফিস (Office of the Equal Opportunities Ombudsman)-এর সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে ২০০৪ সালে একটি চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মসূচীটিকে "নারী ও পুরুষের সম সুযোগ" নামে অভিহিত করা হয়। প্রত্যেক তিন মাস অন্তর প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়—২০ জন সরকারি অফিসার—প্রধানত বিভাগের প্রধান বা সহপ্রধানদের নিয়ে। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে যেসব বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হত, সেগুলির কয়েকটি হল—

(১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে লিঙ্গ সাম্যসংক্রান্ত আইন ও নির্দেশসমূহ।

(২) লিথুয়ানিয়ায় নারী ও পুরুষদের সম অধিকার বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত ব্যবস্থাসমূহ, যার মধ্যে ছিল সংসদীয়, সরকারি, বেসরকারি ও স্থানীয় স্তরের অন্তর্ভুক্তি।

(৩) সম সুযোগসংক্রান্ত অম্বুডস্ম্যান অফিসের কার্যধারাসমূহ, বিশেষত লিঙ্গসমতাসংক্রান্ত আইনগত বিষয়সমূহ।

(৪) ইউরোপীয় ইউনিয়নে সম অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা।

(৫) শ্রমবাজারে, বিশেষত জনপ্রশাসনে নারী ও পুরুষসংক্রান্ত বিষয়সমূহ।

(৬) রাজনীতিতে ও বাস্তব জীবনে নারী ও পুরুষের অবস্থান সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ।

(৭) সি.ই.ডি.এ.ডব্লিউ. (CEDAW)-এর কার্যাবলি।

(৮) মিউনিসিপ্যাল স্তরে লিঙ্গসাম্য সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ।

কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীরা লিঙ্গসাম্য সংক্রান্ত সরকারি কর্মসূচি ও প্রয়োজনীয় তথ্য এবং লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে পরিচিত হয় এবং লিঙ্গ সংক্রান্ত প্রাত্যহিক সমস্যাসমূহ মোকাবিলা করার উপযোগী দক্ষতালাভ করে—যেমন গার্হস্থ্য হিংসা বা কর্মস্থলে যৌন নির্যাতনে সমস্যা ইত্যাদি।

আমরা যদি লিঙ্গ সমতাসংক্রান্ত কাজকে উন্নততর করতে চাই, তাহলে সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের লিঙ্গ সমস্যার বিভিন্ন দিক, লিঙ্গসমস্যা সমাধানের বিভিন্ন উপায় ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন আর এজন্য ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যা তাদের ভবিষ্যতে জনপ্রশাসনে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারে।

১.১৪ উপসংহার

লিঙ্গ সাম্য একদিকে উন্নয়নের অপরিহার্য লক্ষ্য এবং অন্যদিকে ভবিষ্যতের মানব উন্নয়নের চালিকাশক্তি। জনপ্রশাসনে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আদর্শগত মান অর্জনের জন্য লিঙ্গগত বৈচিত্র্য থাকা প্রয়োজন। নারী ও পুরুষ উভয়কেই শ্রমশক্তি হিসাবে কার্যক্ষেত্রে সংযুক্ত করলে উভয়েরই গুরুত্ব স্বীকৃত হবে। আন্তর্জাতিক আইনসমূহ দেশের সরকারি কাজে প্রত্যেকের অংশগ্রহণের অধিকারকে স্বীকার করে। কিন্তু জনপ্রশাসনে বিশেষত সিদ্ধান্তগ্রহণ স্তরে নারীদের ও পুরুষদের সমান সুযোগ ও অধিকার এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। নারী জনপ্রশাসকের সংখ্যা বৃদ্ধি না ঘটলে জনপ্রশাসন দেশের শ্রমশক্তির পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারবে না। নারীরা জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অংশ। তাদের সামর্থ্য ও সৃজনশীলতা দ্বারা তারা দেশের উন্নয়নের কাজে পুরুষদের সঙ্গে সমভাবে যুক্ত হলে তবেই দেশের পূর্ণ উন্নতি সম্ভব হবে এবং জননীতি ও জনপ্রশাসন সমৃদ্ধ হবে।

১.১৫ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) জনপ্রশাসন ও লিঙ্গ সংক্রান্ত মানব মূলধন তত্ত্ব ও সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের বক্তব্যগুলি লিখুন।

(২) লিঙ্গ ও জনপ্রশাসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনগুলির বক্তব্য আলোচনা করুন।

(৩) লিঙ্গ-সাম্য বা অসাম্যের ওপর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাব আলোচনা করুন।

(৪) লিঙ্গ সমতার জন্য লিথুয়ানিয়ার চাকরীকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীটি লিখুন।

(৫) সরকারি অফিসে লিঙ্গ-বৈষম্য প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনগুলি কী কী?

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) জনপ্রশাসনে লিঙ্গ বৈষম্যের সুবিধাগুলি কী কী?

(২) বিশ্বায়নের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লিখুন।

(৩) সরকারি অফিসে লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিরোধ সংক্রান্ত কয়েকটি আন্তর্জাতিক আইনের উল্লেখ করুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) লিঙ্গ বলতে কী বোঝানো হয়?

(২) জনপ্রশাসন শব্দটির অর্থ কী?

(৩) জনপ্রশাসনে পিতৃতন্ত্র বলতে কী বোঝানো হয়?

(৪) লিঙ্গ ও জনপ্রশাসন সংক্রান্ত ইউ.এন.ডি.পি. প্রতিবেদনে উল্লিখিত তিনটি প্রবণতার উল্লেখ করুন।

(৫) লিঙ্গ ও জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্কৃতিগত বাস্তবতা বলতে কী বোঝানো হয়?

১.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

Commilla Stivers, *Gender Images in Public Administration*, 2002.

Maria J. Agostino and Helisse Levine, *Women in Public Administration: Theory and Practice*, 2011.

UN, Report of Economic and Social Council for 1997.

একক-২ ❑ জনপ্রশাসন ও সুশীল সমাজ

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ সুশীল সমাজ ও জনপ্রশাসন-ধারণা দুটির পরিবর্তনশীল দৃষ্টিকোণ বা পরিপ্রেক্ষিত

২.৪ সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন—উভয়ের পারস্পরিক প্রভাব

২.৫ সুশীল সমাজের অবদান

২.৬ ভারতবর্ষে সুশীল সমাজ ও জনপ্রশাসন

২.৭ উপসংহার

২.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে যেসব বিষয় সম্বন্ধে জানা যাবে, সেগুলি হল :

- সুশীল সমাজের অর্থ ও সুশীল সমাজের ধারণার বিবর্তন।
- সুশীল সমাজ ও জনপ্রশাসন—উভয় ধারণার পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিত।
- সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন—উভয়ের মিথস্ক্রিয়া এবং উভয়ের পারস্পরিক প্রভাব।
- ভারতে সুশীল সমাজ ও জনপ্রশাসনের সম্পর্ক।

২.২ ভূমিকা

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নসংক্রান্ত কাজে যেসব সংস্থা ও ব্যক্তি যুক্ত থাকেন, তাঁদের কাছে জনপ্রশাসন ও সুশীল সমাজ হল দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় ধারণা। কিন্তু ধারণা দুটি সম্পর্কে কোন ঐক্যমত্য বা স্বীকৃত সংজ্ঞা নেই। তাছাড়াও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধারণা দুটির অর্থও পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

আলোচনার প্রথমে ধারণা দুটিকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সুশীল সমাজ বলতে বোঝায় বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমষ্টিকে, যেগুলি নাগরিকদের স্বার্থ ও নাগরিকদের বক্তব্যসমূহকে প্রকাশ করে। সুশীল সমাজ হল রাষ্ট্রীয় এলাকা ও ব্যবসার বাইরে অবস্থিত বিশাল ক্ষেত্র, যেখানে জনগণ সংযুক্ত হয় এবং মিলিতভাবে তাদের স্বার্থ ও কণ্ঠস্বর ব্যক্ত করে। সুশীল সমাজকে অনেকে সমাজের তৃতীয় ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করেন,

কারণ এটি সরকার ও ব্যবসায় এলাকা থেকে স্বতন্ত্র অবস্থানযুক্ত। সুশীল সমাজ গঠনকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈশিষ্ট্য হল স্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণ।

জনপ্রশাসন হল সরকারি কার্যক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত বিষয়। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এককের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরের সরকারি সংস্থাসমূহের কাজকারবার বা সরকারি কর্মসূচির পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও তদারকি এবং শাসন, আইন ও বিচারবিভাগীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ হল জনপ্রশাসনের কাজ। জনপ্রশাসনের সরকারি সংস্থাগুলি রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য সরকারি নীতি নির্ধারণ করে, আইনপ্রণয়ন করে, আইনের ভিত্তিতে মামলার বিচার করে, জনগণকে নিরাপত্তা প্রদান করে এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার বন্দোবস্ত করে। তাদের কাজ হল দেশের জনগণের জন্য পণ্য ও সেবা উৎপাদন, সেই উদ্দেশ্যে সংগঠন নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা গ্রহণ। তারা হয় বিনামূল্যে নয় স্বল্পমূল্যে জনগণকে পণ্য ও সেবা প্রদান করে।

২.৩ সুশীল সমাজ ও জনপ্রশাসন-ধারণা দুটির পরিবর্তনশীল দৃষ্টিকোণ বা পরিপ্রেক্ষিত

সুশীল সমাজ ধারণাটির উদ্ভব ঘটে প্রাচীন গ্রীকসমাজে। অ্যারিস্টটল তাঁর পলিটিক্স (Politics) গ্রন্থে সুশীল সমাজ বলতে গ্রীক নগর-রাষ্ট্র বা পলিস্-এর সমবিস্তারযুক্ত সমগ্র সমাজকে নির্দেশ করতেন। সুশীল সমাজ ও নগর-রাষ্ট্র উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল জনকল্যাণ বা সাধারণ কল্যাণ। গ্রীক আদর্শ রাষ্ট্র ছিল ন্যায়ভিত্তিক সুশীল সমাজ, যেখানে জনগণ সাধারণ কল্যাণের জন্য নিজেদের সমর্পণ করে এবং জ্ঞান, সাহস, সংযম, ন্যায় ইত্যাদি নাগরিক গুণের চর্চা করে। রোমান লেখক সিসেরো-প্রবর্তিত সুশীল সমাজের অর্থ ছিল উত্তম সমাজ, যা জনগণের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। গ্রীক ও রোমান চিন্তাবিদ্‌রা রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন নি। তাঁরা মনে করতেন যে রাষ্ট্র সুশীল সমাজ বা সমাজের নাগরিক রূপ বা ফর্মের প্রতিনিধিত্ব করে আর সমাজের নাগরিক রূপ বা ফর্ম বলতে তখন বোঝাত উত্তম নাগরিকের বৈশিষ্ট্যসমূহকে। মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের অভিনব ব্যবস্থার জন্য সুশীল সমাজের ধারণাটি মূলধারার আলোচনা থেকে কার্যত বিদায় নেয়। তখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ন্যায় যুদ্ধের ধারণা। রেনেশাঁস যুগের শেষ পর্যন্ত এই ধারণা প্রচলিত ছিল। তিরিশ বছরের যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী ওয়েস্টফলিয়া চুক্তি সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। রাষ্ট্রসমূহ ভূখণ্ডভিত্তিক সার্বভৌম রাজনৈতিক এককে পরিণত হয় এবং রাজা রাষ্ট্রের শাসক হিসাবে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে সামন্তপ্রভুদের কর্তৃত্ব হ্রাস পায়। সামন্তপ্রভুদের দ্বারা প্রদত্ত বাহিনীর বদলে রাজা নিজস্ব জাতীয় সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। শাসনের সুবিধার জন্য রাজা পেশাদারি আমলাতন্ত্রের সূত্রপাত করেন, অর্থসংক্রান্ত বিভাগসমূহও গঠন করেন। ফলে রাজা প্রজাদের ওপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজা সমগ্র অর্থনীতিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। এগুলির ফলে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপে সামগ্রিকতাবাদী স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

জ্ঞানদীপ্তির যুগে (Enlightenment era) স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। রাজা বা শাসকের রাজনৈতিক বৈধতা ও নৈতিক কর্তৃত্বের দাবিকে বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ বিভিন্নভাবে বিচার করেন। হবসের মতে মানুষ পরস্পর-বিরোধী প্রকৃতিযুক্ত আত্মস্বার্থ দ্বারা চালিত হয়। তাই প্রকৃতির রাজ্য, তাঁর মতে, সকলের সঙ্গে সকলের যুদ্ধের অবস্থায় পরিণত হয়, যা সাধারণভাবে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। যুক্তিবাদ এবং আত্মস্বার্থের

তাগিদই আবার জনগণকে নিজেদের দ্বারা সৃষ্ট নৈরাশ্য থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তাই তারা নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা একটি চুক্তির মাধ্যমে একটি সাধারণ কর্তৃত্বের কাছে সমর্পণ করে, যা ছিল রাষ্ট্র। হবস সমাজের শৃঙ্খলা ও শিষ্টতা রক্ষার জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের কথা বলেন।

লকের সময় ছিল গৌরবময় বিপ্লবের যুগ। এই সময়ে দেখা যায় রাজার শাসনের অধিকারের সঙ্গে পার্লামেন্টের রাজনৈতিক অধিকারের বিরোধ। তাই লকের সামাজিক চুক্তি সীমাবদ্ধ রাষ্ট্র ও শক্তিশালী সুশীল সমাজের কথা বলে। লকের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন প্রথমে শান্তিপূর্ণ হলেও পরে তা অরাজক অবস্থায় পরিণত হয়। তাই জনগণ একত্রিত হয়ে দুটি চুক্তি সম্পাদন করে। তারা প্রথম চুক্তিটি দ্বারা একটি সাধারণ সামাজিক কর্তৃত্ব স্থাপন করে। কিন্তু এই সাধারণ কর্তৃত্বের আইন প্রণয়ন বা আইন প্রয়োগের কোন ক্ষমতা ছিল না। দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা তারা রাষ্ট্রগঠন করে—কিন্তু জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করার কোনো ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয় চুক্তিটি রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সীমাও নির্দেশ করে দেয়। রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হলে তিনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবের অধিকারকেও সমর্থন করেন। তবে হবস ও লক রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র সুশীল সমাজের অস্তিত্বকে স্বীকার করেননি। তাঁরা উভয়ের সহ-অবস্থানকে সমর্থন করেন।

হেগেল সুশীল সমাজের ধারণাকে পরিবর্তিত করেন। তিনি সুশীল সমাজ সম্পর্কে আধুনিক উদারনীতিবাদী ধারণার সূত্রপাত করেন। তাঁর মতে সুশীল সমাজ হল আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র ধারণা, যা বাজার সমাজের দ্যোতক। মার্ক্সের মতে সুশীল সমাজ হল ভিত্তি, যেখানে উৎপাদিকা শক্তি ও সামাজিক সম্পর্ক ঘটে এবং রাজনৈতিক সমাজ হল সুশীল সমাজের ভিত্তির উপর নির্মিত কাঠামো বা উপরিকাঠামো। তিনি সুশীল সমাজের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংযোগের কথা বলেন। তাঁর মতে, সুশীল সমাজ বুর্জোয়া শিল্প মালিকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে এবং উপরিকাঠামো হিসাবে রাষ্ট্র বুর্জোয়া মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। তিনি রাষ্ট্রের কোন ইতিবাচক ভূমিকা আছে বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে রাষ্ট্র হল বুর্জোয়া শিল্প মালিকদের শাসনবিভাগীয় হাত। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন যে শ্রমজীবী শ্রেণি সমাজের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ করায়ত্ত করলে রাষ্ট্র অবলুপ্ত হবে। গ্রামসি সুশীল সমাজকে মার্ক্সের মত রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ভিত্তির সমার্থক বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে সুশীল সমাজ হল বুর্জোয়া নেতৃত্বের মাধ্যম। তিনি রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর মধ্যে তার অবস্থানের কথা বলেন। নব্য বামপন্থীরা মনে করেন যে রাষ্ট্র ও ব্যবসা ক্ষেত্রের খামখেয়ালির বিরুদ্ধে জনগণকে রক্ষা করার ব্যাপারে এবং রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মত প্রতিষ্ঠার জন্য সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নব্য উদারনীতিবাদীরা সুশীল সমাজকে এমন একটি সংগ্রামক্ষেত্র হিসাবে মনে করেন, যা কমিউনিস্ট ও কর্তৃত্ববাদী শাসকদের উচ্ছেদ করতে পারে।

জনকল্যাণকর ব্যবস্থাসমূহের পুনর্গঠন তত্ত্ব অনুসারে সুশীল সমাজের ধারণাটি নব্য উদারনীতিবাদী মতাদর্শ হিসাবে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের পরিবর্ত ধারণা, গণতান্ত্রিকীকরণের আদর্শের পরিবর্ত নয়। ১৯৮০ থেকে বিভিন্ন অসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের (NGO) আবির্ভাব এবং বিশ্বব্যাপী নব্য সামাজিক আন্দোলনের বিস্তৃতির ফলে সুশীল সমাজের ধারণাটি সামাজিক বিশ্বব্যবস্থার যুদ্ধকৌশল পরিচালনার উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ বিকল্পে পরিণত হয়েছে। জিলান সোয়েডারের মতে, সুশীল সমাজের তখনই উদ্ভব ঘটে, যখন শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বা সামাজিক প্রয়োজনসমূহের সমাধানের জন্য সরকারী উত্তর দাবি করে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহ রাষ্ট্রের অনুমোদিত কাজের সীমাকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

আধুনিক কালে অসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলি দ্রুতহারে স্থানীয় ও জাতীয় পটভূমি থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী নানা পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আন্তর্জাতিক কারক ও সংস্থা হিসাবে দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থ ও বাণিজ্যসংস্থা, আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও তার বিভিন্ন সংস্থা, বহুজাতিক কর্পোরেশন, আন্তর্জাতিক সম্মেলন ইত্যাদি। এগুলি বিশ্বস্তরে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে দ্রুতহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ (NGO) বিশ্বস্তরে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে দেরীতে এসেছে, কিন্তু তারাও উন্নয়নসংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করছে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপ হিসাবে জনপ্রশাসনের প্রচলন দেখা যায় অনাদিকাল থেকেই। রোমের সম্রাট বিস্তৃত এলাকা শাসন করতেন এবং বিস্তারিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটান। ব্যক্তিজীবনের প্রতি স্তরে জনপ্রশাসন তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। নিয়ন্ত্রণমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে পরে ধীরে ধীরে কল্যাণমূলক প্রশাসন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। শিক্ষণীয় বিষয় বা শাস্ত্র হিসাবে জনপ্রশাসন হল সাম্প্রতিক ব্যাপার। উড্রো উইলসনের হাতে জনপ্রশাসন শাস্ত্রের সূত্রপাত ঘটে। তিনি ১৮৮৭ সালে জনপ্রশাসনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বিকাশের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি রাজনীতি ও প্রশাসনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। তাঁকে অনুসরণ করে শুভনাউ বলেন যে রাজনীতির বিষয় হল রাষ্ট্রীয় নীতি বা ইচ্ছার প্রকাশ আর জনপ্রশাসনের এক্তিয়ার হল রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহের প্রয়োগ ও তাদের কার্যকর করা। তাঁদের অনুবর্তী হয়ে অন্যান্য লেখক—লুথার গালিফ, হেনরি ফয়েল, হোয়াইট—ইত্যাদিরা রাজনীতি-প্রশাসন দ্বিবিভাজনের ওপর জোর দেন, যার মূল বক্তব্য হল নীতি প্রণয়ন বনাম নীতি প্রয়োগ।

পরবর্তীকালে রাজনীতি-প্রশাসন দ্বিবিভাজনকে অবাস্তব ও অবাঞ্ছিত বলে গণ্য করা হয়, কারণ প্রশাসন হল বাস্তব জগতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহ পূরণের উপায় আর তাই রাজনৈতিক নীতি প্রণয়ন ও তাদের প্রশাসনিক প্রয়োগ সর্বত্রই মিশ্রিত থাকে।

জনপ্রশাসন ক্রমে ক্রমে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে এবং দাবি করে যে তার সিদ্ধান্তসমূহ সব সংগঠনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জনপ্রশাসনের তিনটি বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়—বৈজ্ঞানিক পরিচালনা, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ পরিচালনা।

১৯৪০ থেকে আচরণবাদী, তুলনামূলক, পরিবেশগত এবং ওয়েবারীয় বিশ্লেষণ—প্রসারলাভ করেছে এবং জনপ্রশাসন ও রাজনীতির যোগসূত্রকে পুনঃসমর্থন প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়াও আছে উত্তর-আচরণবাদী, আন্তঃশাস্ত্রবিষয়ক এবং মূল্যবোধভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিমসূহ। বিংশ শতক (১৯৬০) থেকে উন্নয়ন প্রশাসন ও নব্য জনপ্রশাসন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক পথে উন্নয়ন প্রচেষ্টা পরিচালিত হচ্ছে। প্রশাসনের নব্য জন উন্নয়ন প্রচেষ্টাগুলি লিঙ্গসাম্য, পরিবেশগতভাবে নিরাপদ উন্নয়ন, শিশুর বিকাশ, স্থানীয় নেতৃত্বের উদ্ভব, তৃণমূল স্তরের জনগণকে প্রশাসনের অংশীদার করা ইত্যাদির মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক প্রশাসনের ধারণার জন্ম দিচ্ছে। অর্থাৎ আধুনিক জনপ্রশাসন নানাভাবে সুশীল সমাজের সঙ্গে আরও বেশি সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ছে।

২.৪ সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন—উভয়ের পারস্পরিক প্রভাব

সরকার ও সুশীল সমাজের মধ্যে সম্পর্ক এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও মিথষ্ক্রিয়ার ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। এই মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ থেকে কিছু ধারণা ও প্রকল্প উদ্ভূত হয় এবং সেগুলি রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের কাছে প্রেরিত হয়। জনগণ নাগরিক হিসাবে একত্রিত হয়ে তাদের স্বাধীন মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করতে চায়। সুশীল সমাজ হল এইসব মতামতের সংগঠিত প্রকাশ এবং রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের মধ্যে সুসম্পর্ক হল যে কোন গণতন্ত্রের ভিত্তি। বৈচিত্র্যময় ধারণা ও পরস্পরবিরোধী স্বার্থকে কেন্দ্র করে নাগরিক বিতর্কসমূহকে সুশীল সমাজ দক্ষতার সঙ্গে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে না পারলে রাষ্ট্র নাগরিকদের থেকে দূরে সরে যায়। তখন রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের মিথষ্ক্রিয়া শুধুমাত্র নির্বাচনী সময়ের মধ্যে সীমাবন্ধ ও সংকুচিত হয়। নির্বাচনী সময়টি আবার স্থিরীকৃত হয় রাজনীতিবিদ্দের দ্বারা। সুশীল সমাজ হল সংগঠিত সামাজিক জীবনের ক্ষেত্র, বা স্বেচ্ছামূলক ও স্বনিয়ন্ত্রিত, বহুল পরিমাণে স্বাবলম্বী, রাষ্ট্রের এলাকা থেকে স্বাধীন এবং আইনগত শৃঙ্খলা বা সরকারি নিয়মের জাল দ্বারা আবন্ধ। সুশীল সমাজ বলতে বোঝায় বিশাল সংখ্যক আনুষ্ঠানিক ও অ-আনুষ্ঠানিক সংগঠন, স্বার্থগোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, নাগরিক ও পৌর উন্নয়ন সংস্থা, ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন, প্রচারমাধ্যম, গবেষণামূলক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং সম ধরনের সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে। সুশীল সমাজের অন্তর্গত হল সমাজস্থ অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, আত্মীয়তাভিত্তিক ও রাজনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ এবং তাদের নেতা ও প্রতিনিধিসমূহ। সুশীল সমাজ হল রাষ্ট্রের আওতা থেকে স্বাধীন স্ব-সংগঠিত গোষ্ঠী, আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিদের সমষ্টি, এমন কি বিক্ষোভকারী ও উচ্ছৃঙ্খল জনতাও এর অন্তর্গত।

সুশীল সমাজ বলতে যে ক্ষেত্র বা যে এলাকায় মিথষ্ক্রিয়া ঘটে, তাদেরকে এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরকে বোঝানো হয়। প্রতিবেশীদের সংগঠন, নারীদের সংগঠন, ধর্মীয় গোষ্ঠী, বৌদ্ধিক ধারার সংগঠন এবং সব শ্রেণী ও পেশাগত ব্যক্তি, যেমন আইনজীবি, সাংবাদিক, ট্রেড ইউনিয়ন, ব্যবসায় উদ্যোগ ইত্যাদি দ্বারা গঠিত নাগরিক ও পৌর সংগঠনসমূহ হল সুশীল সমাজের বিষয়। তারা সকলে মিলিতভাবে সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় যুক্ত থেকে নিজেদের মতো প্রকাশ করতে এবং নিজেদের স্বার্থ পূরণ করতে চায়। পরম্পরাগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক সংস্থা, জনমত প্রকাশের অ-আনুষ্ঠানিক মাধ্যম ইত্যাদি সুশীল সমাজের ক্ষেত্র বা এলাকা হিসাবে পরিচিত ছিল। আজকের ডিজিটাল যুগে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম, ইন্টারনেট, বেতার যোগাযোগ, মোবাইল ইত্যাদি সুশীল সমাজের এলাকা বা সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এগুলি আবার মূল্যবোধ ও প্রকল্পসমূহের সাংস্কৃতিক সংগ্রহস্থলের কেন্দ্র, যা পাবলিক বিতর্কের জন্ম দেয়।

আমরা সুশীল সমাজের কাজের সঙ্গে সঙ্গে কাঠামোগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি। এর ফলে সুশীল সমাজ কী, তার বদলে সুশীল সমাজের কাজ কী সেই পরিপ্রেক্ষিত থেকে সুশীল সমাজকে অনুধাবন করতে পারি।

সুশীল সমাজের বিভিন্ন কাজগুলি সদস্যদের নিম্নোক্ত ক্ষমতাগুলি প্রদান করে—

(১) সদস্যদের নিজ বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে এবং দাবি উপস্থাপন করতে সাহায্য করে।

(২) সদস্যরা রাষ্ট্রের সামনে তাদের অধিকারগুলিকে পেশ করতে পারে।

(৩) সদস্যরা রাষ্ট্রীয় সংস্থার ওপর নির্ভর না করে প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে।

জনগণের স্বার্থ, অধিকার ও প্রয়োজনসমূহ যাতে দমিত রাখা না হয়, বরং পরিপূর্ণ করা হয় তা সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করে সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংগঠনসমূহ। এই কাজগুলি রাষ্ট্রও সম্পাদন করে থাকে। সুতরাং রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজ পরস্পরবিরোধী অবস্থানযুক্ত নয়। সুশীল সমাজের কাজ সম্পাদনের ধরন নির্ভর করে সমাজের মধ্যে কিছু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্তিত্বের ওপর। এইসব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুকূল পরিবেশে নীতি, পদ্ধতি, পূর্ববর্তী নজির ইত্যাদির ভিত্তিতে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। সমর্থনসূচক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও আদর্শ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি এইসব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈধতা দান করে। ফলে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহ স্বাধীনভাবে কাজ সম্পাদন, আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুশীলন এবং ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিসংক্রান্ত নিরাপত্তা উপভোগ করতে পারে।

সুশীল সমাজের যথাযথ কাজের জন্য সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যবোধ নাগরিকদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করে। জনগণের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ ও স্বাধীনভাবে কাজের সামর্থ্য সুশীল সমাজকে সুদক্ষভাবে কাজের শক্তি ও সুযোগ প্রদান করে। বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সুশীল সমাজের কাজের সামর্থ্য সৃষ্ট হয় এবং সেই সামর্থ্যের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্র ও সুশীল সমাজের মিথষ্ক্রিয়ার ভিত্তিতেই স্থিরীকৃত হয় সুশীল সমাজের কাজের সামর্থ্য—জানা যায় একটি নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে সুশীল সমাজ কতটা ভালভাবে কাজ করতে পারে। একটি সামগ্রিকতাবাদী বা একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিজের মধ্যেই সুশীল সমাজের যাবতীয় অনুমোদনযোগ্য কাজ কেন্দ্রীভূত করতে পারে এবং অ-অনুমোদনযোগ্য কাজগুলিকে অপরাধমূলক বা বেআইনী ঘোষণা করতে পারে। সেই পরিবেশে সুশীল সমাজ খুবই কম শক্তিসম্পন্ন ও কার্যকর হতে পারে। বিপরীত পরিবেশে যেখানে রাষ্ট্র সংগঠিত নাগরিকদের দ্বারা প্রবর্তিত বহুবিধ স্বাধীন কাজকে মেনে নেয়, উৎসাহ দেয় এবং স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে দেয়, সেখানে সুশীল সমাজ অনেক বেশী শক্তিশালী ও কার্যকর হয়। অর্থাৎ সুশীল সমাজের শক্তি নির্ভর করে রাষ্ট্র কি প্রকৃতির এবং সুশীল সমাজকে কতটা স্বাধীনভাবে চলতে দেয় তার ওপর। সুশীল সমাজকে শক্তিশালী করতে হলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুশীল সমাজের কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হবে এবং রাষ্ট্রকে নাগরিকদের জীবনের রক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে কাজ করতে হবে। রাষ্ট্রের এই ভূমিকা থাকলে রাষ্ট্রীয় সমর্থনের ভিত্তিতে সুশীল সমাজের গণতান্ত্রিক সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। সুশীল সমাজের ক্রিয়াকলাপ ও কাজের ধরন নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা, সমর্থন ও অনুমোদনের ওপর। সুশীল সমাজের সামর্থ্য এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা একইসঙ্গে ইতিবাচকভাবে বৃদ্ধি পেতে বা নেতিবাচকভাবে হ্রাস পেতে পারে। রাষ্ট্রের নীতিপ্রণয়ন ও প্রশাসন সংক্রান্ত যোগ্যতা এবং সুশীল সমাজের স্বাধীনভাবে স্বনির্বাচিত ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার সামর্থ্যের ওপর প্রকৃত ফলাফল নির্ভর করে। অর্থাৎ উভয়ের সম্পর্ক পরস্পরবিরোধী নয়। গণতন্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং অন্যায়অবিচার বন্ধ করার জন্য সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়কেই শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক আন্দোলনসমূহ উভয় দিককে প্রভাবিত করেই অগ্রসর হতে পারে। তাই তাদের উভয় দিকের সঙ্গেই সংযোগ সাধন করতে হবে। সুশীল সমাজ রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যেসব সংগঠন ও সংস্থা সুশীল সমাজের উদ্দেশ্যসমূহকে বাস্তবায়িত করে তাদের অনেকেই অবশ্য রাষ্ট্রের আওতা থেকে স্বাধীন, কিন্তু সব সংগঠন ও সংস্থা অবশ্যই নয়।

যদি আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ এবং জাতীয় স্তরের নিম্নবর্তী সরকারি সংস্থাসমূহ (যেগুলি রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত)-কে কার্যকর করতে হয় তাহলে তাদের সকলকে অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। অন্যদিকে সুশীল সমাজের অন্তর্গত স্বশাসিত এককগুলির নাগরিক স্বার্থ সংরক্ষণের সামর্থ্য

বা নাগরিকদের অনুকূল শর্তে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করার ক্ষমতা নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় সংস্থা বা রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত সংস্থাগুলির পছন্দ-অপছন্দ-পক্ষপাতের ওপর। অরাষ্ট্রীয় কারক বা সুশীল সমাজের সংস্থাগুলি খালি নিজেরা নিজেদের মধ্যে কাজ করে—এ কথা মনে করা ঠিক নয়, কারণ তাদের অস্তিত্ব ও কাজের সঙ্গে তা মেলে না। যে কোন সমাজে সুশীল সমাজের সম্ভাব্য ক্ষমতা ও শক্তি হল সেখানকার রাষ্ট্র ও অরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রসমূহের সংযোগ ও সম্পর্কেরই প্রতিচ্ছবি।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ৬টি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হল। তারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সৃষ্টি করে, যদিও তাদের সংগঠন ও ক্ষমতা বিভিন্ন রাষ্ট্রে একরকম নয়।

রাষ্ট্রীয় কাঠামো :

(১) শাসন বিভাগ : এই বিভাগটি রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ও ব্যাপক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। এই বিভাগটিকে অনেক ক্ষেত্রেই শাসক হিসাবে গণ্য করা হয়। ব্রিটেনে এর নাম হল সরকার, আমেরিকায় একে প্রশাসন বলা হয়। শাসনবিভাগের অন্তর্গত ব্যক্তিদের সুশীল সমাজের অংশ বলা হয় না। তারা যদি নাগরিক স্বার্থ ও প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল হয় আর সুশীল সমাজের কাছে দায়িত্বশীল থাকে, তাহলে সুশীল সমাজ অনেক বেশি শক্তিশালী হয়।

(২) প্রশাসন : সরকারের উচ্চপদে নিযুক্ত স্থায়ী কর্মচারী বা জনপালনকৃত্যক, যা সাধারণভাবে আমলাতন্ত্র নামে পরিচিত তাকেই প্রশাসনের দায়িত্বে দেখা যায়। এই বিভাগ মোটামুটি স্বাধীনভাবে কাজ করে। সরকার সব প্রশাসনিক বিষয়ে, বিশেষত অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে এই বিভাগের ওপর নির্ভর করে। সরকারি নীতিসমূহকে এই বিভাগই বাস্তবে রূপায়িত করে। এই বিভাগ সরকারি নীতি প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ করে, শাসন পরিচালনার জন্য রাজস্ব সংগ্রহ করে। সরকারের প্রশাসন অংশ ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে। এই বিভাগ নাগরিকদের নাগরিক স্বার্থ রক্ষা করতে এবং নাগরিকদের অধিকার বাস্তবায়িত করতে পারে। এই বিভাগ দক্ষতার সঙ্গে যথাযথভাবে কাজ করলে সুশীল সমাজের সব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সাফল্যলাভ করতে পারে। আর তা না করলে বিভাগটি সুশীল সমাজের চাপ ও বিরোধীতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

(৩) সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ : এই বিভাগের অন্তর্গত হল সেই সব ব্যক্তি যারা রাষ্ট্রের বকলমে বল বা শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ভোগ করে। এর অন্তর্গত হল গোয়েন্দা সংস্থা এবং নিরাপত্তা বাহিনী। যেখানে বেসামরিক কর্তৃত্ব বেশি শক্তিশালী, সেখানে এই বিভাগ শাসনবিভাগ, প্রশাসন ও আইনবিভাগের অধীন হয় আর সেখানকার সুশীল সমাজ শক্তিশালী হয়। কিন্তু যেখানে এই বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে বা যেখানে শাসকরা এই বিভাগের পুতুলে পরিণত হয়, সেখানে সুশীল সমাজের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সেখানকার সুশীল সমাজের সংগঠিত মতপ্রকাশ ও ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষিত হতে পারে।

(৪) আইনসভা : নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে এই বিভাগ গঠিত হয়। এই বিভাগ আইন প্রণয়ন করে, বাজেট অনুমোদন করে এবং কোন কোন দেশে সরকার বা শাসনবিভাগকে গঠন করে। কোন কোন দেশে আবার আইন বিভাগ সামরিক বাহিনী বা শাসনবিভাগের রবার স্ট্যাম্প হিসাবে কাজ করে। যেসব দেশের আইন বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে, সেখানে এই বিভাগ সুশীল সমাজের স্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর বা মাধ্যম হিসাবে কাজ করে এবং সেখানে সুশীল সমাজ শক্তিশালী হয়। অন্যরকম হলে সুশীল সমাজ দুর্বল হয়।

(৫) বিচার বিভাগ : অধিকাংশ দেশেই বিচারবিভাগের বিচারকরা শাসনবিভাগ দ্বারা নিযুক্ত হন, কোথাও কোথাও তাঁরা আবার আইনবিভাগ দ্বারা নির্বাচিত হন। তাঁরা অর্থসংস্থান ও বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত রূপায়ন—এই দুটি ক্ষেত্রে শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ ও প্রশাসনের ওপর নির্ভর করেন, কিন্তু তাঁরা সরকারের এই বিভাগগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার বা তাদের ক্ষমতাসমূহ সীমাবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব ও বৈধতা ভোগ করেন। বিচারবিভাগীয় সংস্থাগুলি হল ক্রমস্তর বিন্যস্ত। সর্বোচ্চ স্তরে আছে জাতীয় স্তরের সর্বোচ্চ বিচারালয়। দেশের জনগণ বিচারবিভাগীয় সংস্থাগুলির কাছ থেকে ন্যায়বিচার পেতে পারে—বিচারবিভাগ সকলের নাগালের মধ্যে। বিচার বিভাগের ক্রিয়াকলাপ সুশীল সমাজকে শক্তিশালী করে।

(৬) জাতীয় স্তরের অধস্তন সরকারসমূহ : প্রাদেশিক, আঞ্চলিক বা রাজ্য স্তরের সরকারগুলি জাতীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির আওতা থেকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তারা নিজ সাংবিধানিক এলাকায় আঞ্চলিক স্বার্থ ও প্রয়োজন অনুসারে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। তাদের যদি কর আরোপের নিজস্ব ক্ষমতা থাকে, তাহলে তারা নিজ এলাকার জনগণের ভালভাবে সেবা করতে পারে। ফলে সুশীল সমাজের কার্যসম্পাদন সুচারু হতে পারে।

সুশীল সমাজের কাঠামো :

সব দেশেই সুশীল সমাজের স্বার্থ রক্ষাকারী কিছু সাংগঠনিক কাঠামো দেখা যায়। চারধারে সীমারেখা টেনে সুশীল সমাজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাচীরবদ্ধ এলাকায় পরিণত করা যায় না। যেসব বিভিন্ন সংগঠন সুশীল সমাজের কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে সেগুলি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে—সামাজিক কাঠামোর সেইসব অংশ যারা কোন না কোনভাবে রাষ্ট্রের সংস্থাসমূহের যুক্ত সেগুলি থেকে সেই সব অংশ যারা কার্যত স্বাধীন সেগুলিও হতে পারে। বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, তাদের নেতৃত্ব ও পরিবেশের তারতম্যের ভিত্তিতে, ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির দরকষাকষির সামর্থ্য বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারে। অরাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলির শুধুমাত্র স্বাধীনতা থাকলেই হবে না, বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে এবং রাষ্ট্র ও বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলির মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতার সম্পর্কও থাকা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলি হল—

(১) রাজনৈতিক দল : সমস্ত রাজনৈতিক দলই জনগণের স্বার্থ ও প্রয়োজনের প্রতিনিধিত্ব করে—কখনও কখনও প্রবলভাবে। রাজনৈতিক দল যখন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উচ্চস্তরে আঞ্চলিক, পেশাগত, মতাদর্শগত বা অন্যান্য স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, তখন সেগুলি সুশীল সমাজের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। ইতিহাসে দেখা গেছে যে এক-দলীয় কাঠামো সাধারণত রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হাতকেই জোরদার করে। তবে যদি দলটির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গণতন্ত্র থাকে তাহলে অবস্থা অন্যরকম হতে পারে। ইতিহাসে আরও দেখা গেছে যে বহুদল ব্যবস্থা রাজনৈতিকভাবে আধিপত্যযুক্ত অভিজাত শ্রেণীর গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করে, সামগ্রিকভাবে সমাজের স্বার্থ নয়, তাই বহুদল ব্যবস্থাযুক্ত রাষ্ট্রও শক্তিশালী সুশীল সমাজের অস্তিত্বের কোন নিশ্চয়তা দেয় না। নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে কার্যকর আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে দলগুলির ভূমিকা ও অবদান বিবেচনা করা প্রয়োজন।

(২) গণমাধ্যম : অনেক দেশেই গণমাধ্যম—দূরদর্শন, বেতার, সংবাদপত্র—রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে সর্বত্র তা হয় না। অনেক সময় সাংবাদিকরা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অসদাচরণ বা দুর্নীতি প্রকাশ করে দেন এবং অ-রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পক্ষে কাজ করেন। তাদেরকে সুশীল সমাজের অংশ বলা যায়। আধুনিক কালে ডিজিটাল বিপ্লবের পর ইন্টারনেট ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ায় সুশীল সমাজের শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে।

(৩) স্থানীয় সরকার : জেলা, অঞ্চল বা গ্রামের স্থানীয় স্তরের সরকারসমূহ সুশীল সমাজের অংশ হিসাবে কাজ করে; তবে তাদের আর্থিক সংস্থান ও আইনগত স্বাধীনতার অস্তিত্বের ওপর তাদের ভূমিকা নির্ভর করে। তারা যদি কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে চলার সামর্থ্যযুক্ত হয় এবং নাগরিকদের পছন্দমত কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে, তাহলে তাদের পক্ষে অ-রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও প্রয়োজন পূর্ণ করা সম্ভব হয়, কিন্তু যদি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্প্রসারণ হিসাবে তাদের দেখা যায়, তাহলে তারা সুশীল সমাজের অংশ হতে পারে না।

(৪) ব্যবসা ক্ষেত্র : ব্যবসা সংক্রান্ত উদ্যোগের যে অংশ শুধুমাত্র পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন ও ব্যক্তিগত মুনাফার সঙ্গে যুক্ত, সেই অংশটি সুশীল সমাজের অংশ নয়। কিন্তু কোন কোন ব্যবসার ক্ষেত্র নীতিসংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত এবং জনসেবায় নিয়োজিত; সেই ক্ষেত্রগুলি সুশীল সমাজের অংশ। বিভিন্ন ব্যবসায় উদ্যোগের নিজস্ব আয় ও নিজস্ব অর্থের উৎস আছে। তারা সুশীল সমাজের অন্যান্য অংশগুলির তুলনায় রাষ্ট্রের আওতা থেকে অনেক বেশি স্বাধীন। অনেক দেশের রাষ্ট্রই করের অর্থের জন্য এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ব্যবসায় উদ্যোগগুলির ওপর নির্ভরশীল থাকে। এটাও আবার দেখা গেছে যে ব্যবসাক্ষেত্রের বিশাল অংশই সরকারের সঙ্গে জোট বেঁধে চলে। ব্যবসা শুরুর জন্য সরকারি অনুমোদন লাগে এবং অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সরকারের কাছ থেকে কর ছাড় বা অন্যান্য সুযোগসুবিধা ভোগ করে। সেইসব ব্যবসামালিকদের সঙ্গে সরকারের যোগসাজস প্রবল হয়। সেক্ষেত্রে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সুশীল সমাজের কোন যোগ থাকে না। ফলে সুশীল সমাজ সংক্রান্ত কোন ভূমিকাও তাদের থাকে না। এশিয়ার অনেক দেশেই বর্তমানে লেজুর পুঁজিবাদ (Crony capitalism)-এর প্রভাব দেখা গেছে। সেসব দেশে নানা বিপদও ঘটেছে। তবে ফিলিপাইসে ফার্ডিনান্ড মার্কোসের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের সময় সামাজিক প্রগতির জন্য ফিলিপাইন ব্যবসায়ীগণ (Philipine Businessmen for Social Progress) নামক গোষ্ঠী বলপূর্বক গণতান্ত্রিক শাসন ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

(৫) ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহ : অনেক ধর্মগোষ্ঠী ও তাদের নেতারা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকার জন্য জোর করে, অনেকে আবার রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে চার্চ, মন্দির বা মসজিদ হল সুশীল সমাজের অঙ্গ। ফিলিপাইনে কার্ডিনাল সিনের নেতৃত্বে ক্যাথলিক চার্চ ১৯৮০ থেকে সুশীল সমাজের সক্রিয় অংশে পরিণত হয়। ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক রূপান্তর প্রধানত দুটি জাতীয় মুসলমান সংস্থা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়; তারা শাসকদের কাজকে সমালোচনার চোখে দেখত।

কোন কোন দেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ এত ব্যাপক যে ধর্মীয় নেতারা পুরোপুরি অপার্থিব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তাঁরা কখনোই সর্বসাধারণের বিষয়ে মাথা ঘামান না এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অসাংবিধানিকভাবে পরিচালিত হলেও রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করেন না (উদাহরণ নাইজেরিয়া)। সেখানকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সুশীল সমাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন। যখন চার্চ বা অন্যান্য ধর্ম প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি করে চলে, তখন তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশীদার হয়ে পড়ে। ফলে সেখানকার সুশীল সমাজের শক্তি হ্রাস পায়। দেশের মধ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কতটা রাষ্ট্রের সঙ্গে জোটযুক্ত বা কতটা স্বাধীন সেই প্রশ্ন প্রয়োগিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(৬) ফাউন্ডেশনসমূহ : এগুলি হল অলাভজনক ও মানবতাবাদী বিভিন্ন ধরনের সংগঠন। এগুলি আকারে ছোট, কিন্তু এরা এদের নিজস্ব মতে চলে। অনেকে রাষ্ট্র থেকে স্বাধীন হয়, অনেকে আবার রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগী হয়ে চলে। তাদের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকরা যা যা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে তারা সেই সব বিষয় ও সমস্যাসমূহের মোকাবিলায় যুক্ত থাকে। রাষ্ট্রের এলাকা থেকে স্বতন্ত্র কিছু বাছাই করা ক্রিয়াকলাপের জন্য তারা অর্থ ও বিশেষ জ্ঞান সরবরাহ করে।

(৭) বিশ্ববিদ্যালয় : যেসব বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত ও আর্থিকভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেগুলি সরকারের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। সরকারি কাজের সমালোচনা বা মূল্যায়নের সুযোগ তাদের হয়ে থাকে না, নতুবা কম থাকে। কিন্তু এক গুচ্ছ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্র দেখা যায়, যারা স্বাধীনভাবে চলে; তারা এমন কি সরকারের বিরোধিতাও করে থাকে। ১৯৭৫ সালে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা বিপ্লবের মাধ্যমে থাইল্যান্ডের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটায়। ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক শক্তি হতে পারে। আদর্শ ও জ্ঞান উভয়কে যখন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ একীভূত করে ফেলতে পারে, তখন সেটি সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে।

(৮) ট্রেড ইউনিয়ন : ট্রেড ইউনিয়ন হল একটি সংগঠিত ব্যবস্থা, যার মাধ্যম বিশালসংখ্যক নাগরিকদের স্বার্থ প্রকাশিত, একত্রিত ও উন্নীত করা যায়—তাদের নিজ নিজ জীবিকা অর্জনের শর্তাবলির নিরিখে। কোন কোন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেখানে এই ব্যবস্থা থাকে, সেখানে তারা সুশীল সমাজের অংশ নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা সুশীল সমাজের অংশ হিসাবে ব্যক্তির অধিকার ও স্বার্থসমূহের প্রধান সংরক্ষক। গোষ্ঠী হিসাবে কর্মচারীদের মজুরী ও কাজের পরিবেশ ও শর্তাবলিসংক্রান্ত যৌথ দরকষাকষির ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলি কর্মচারীদের ক্ষমতায়ন ঘটায়। যদি নিয়োগকর্তা বা মালিকের সঙ্গে কোন চুক্তিতে পৌঁছন সম্ভব না হয়, তাহলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি কর্মচারীদের শ্রমদান থেকে বিরত থাকার ব্যবস্থা বা ধর্মঘটের ব্যবস্থা করে।

(৯) পেশাদারী সংগঠনসমূহ : আধুনিককালে বিভিন্ন পেশাদারী সংগঠনসমূহের সম্প্রসারণ ঘটেছে। তারা জনগণ ও সরকার উভয়ের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠিত গোষ্ঠী হিসাবে আইনজীবিরা বিচারব্যবস্থার মধ্যে কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিচারব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে এবং বিচারব্যবস্থা যাতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার উচ্চ আদর্শ অনুসরণ এবং আইনের চোখে সাম্য সুনিশ্চিত করতে পারে তার জন্য সচেষ্ট থাকে। চিকিৎসক সমিতিগুলি শুধুমাত্র তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থই নয়, জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও প্রয়োজনসমূহকে সোচ্চারে ব্যক্ত করতে পারে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসাবে তারা বৈধতা, মর্যাদা ও তথ্যের অধিকার ভোগ করে। তাই রাষ্ট্রের দাবি বা নীতিসমূহের বিরোধিতা করেও তারা জনগণের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। এইভাবে চিকিৎসক সমিতিগুলি পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রাণী সংরক্ষণ, বাঁধ নির্মাণ, অরণ্য নির্মূল করার বিপদ সম্বন্ধে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে জনমত গঠন করতে পারে।

শৈল্পিক সমাজ—লেখক, কবি, গায়ক, চিত্রশিল্পী ইত্যাদিরা তাদের গদ্য বা পদ্যরচনা, নতুন ধ্যানধারণা, সুর ইত্যাদি দ্বারা জনগণের মনকে প্রভাবিত করতে পারে। এইসব সৃজনশীল ব্যক্তিরা সাধারণত প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীনচেতা হন। অনেকে আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কাজের সমালোচনাও করে থাকেন। তাঁরা একটি শক্তিশালী সুশীল সমাজ গঠন করেন; তাঁরা সুশীল সমাজের অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখেন এবং জনসাধারণকে লেখা, গান, শিল্পকর্ম ইত্যাদি দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন। লোকগীতির মাধ্যমেই মার্কিন গণ-অধিকার আন্দোলন ও ভিয়েৎনামের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছিল।

(১০) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বা এন.জি.ও. সংগঠন : এগুলি হল সুশীল সমাজের প্রধান সংগঠন। এই সংগঠনগুলি স্বাধীনভাবে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে নানা ধরনের ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থাকে। তাদের সকলের আকার বা কার্যকারিতা সমান নয়। এগুলি হল বেসরকারি ক্ষেত্রের অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহ। প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও অর্থপ্রদানকারীদের প্রতি দায়বদ্ধ। তারা জাতীয়, রাজ্য বা স্থানীয় যে কোন স্তরেই সংগঠিত হতে পারে। স্থানীয় স্তরের এন.জি.ও.গুলিকে পরবর্তী প্রতিষ্ঠান (তৃণমূল স্তরের প্রতিষ্ঠান) হিসাবে গণ্য করা হল। এন.জি.ও.গুলি কতটা দক্ষতার সঙ্গে তাদের কাজ সম্পাদন করতে পারবে, তা নির্ভর করে তাদের সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রের যোগাযোগ ও সম্পর্কের ওপর।

(১১) তৃণমূল স্তরের সংগঠন : এগুলি হল স্থানীয় স্তরের সংগঠন। কিন্তু এগুলি স্থানীয় ভিত্তিকে বজায় রেখে রাজ্য বা জাতীয় স্তর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক সবসময় দ্বন্দ্বমূলক হয় না, রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানগুলির পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক থাকতে পারে। যেমন, কৃষকদের সংগঠন সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ সেবা বিভাগের সঙ্গে বা জল ব্যবহারকারী সংগঠন সরকারের সেচ বিভাগের সঙ্গে একসঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে পারে।

তৃণমূল স্তরের সংগঠনগুলির মধ্যে আনুভূমিক (horizontal) সংযোগ এবং সুশীল সমাজের অন্যান্য সংস্থাসমূহের সঙ্গে উল্লম্ব (Vertical) সংযোগ থাকলে তৃণমূল স্তরের সংগঠনগুলি সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সুশীল সমাজের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে।

সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শিত হল—

অ-রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠাসমূহের সঙ্গে সুশীল সমাজের মিথষ্ক্রিয়ার ধরন				
রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ		সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ		
মূল সংস্থা	মধ্যবর্তী সংস্থা	মধবর্তী সংস্থা	আধাস্বাধীন সংস্থা	স্বাধীন সংস্থা
১. শাসনবিভাগ ২. প্রশাসন ৩. সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ	৪. আইনসভা ৫. বিচারবিভাগ ৬. জাতীয় স্তরের অধস্তন সরকারসমূহ	১. রাজনৈতিক দল ২. প্রচারমাধ্যম ৩. স্থানীয় সরকার	৪. ব্যবসায় ক্ষেত্র ৫. ধর্মীয় গোষ্ঠী-সমূহ ৬. ফাউন্ডেশন-সমূহ ৭. বিশ্ববিদ্যালয়	৮. ট্রেড ইউনিয়ন ৯. পেশাদারী সংগঠন-সমূহ ১০. এন.জি.ও. সংগঠন ১১. তৃণমূল স্তরের সংগঠন

২.৪ সুশীল সমাজের অবদান

সুশাসনের জন্য সুশীল সমাজের বিভিন্ন কাজগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলি সমাজস্থ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহের উপকারসাধন করে। (১) মানবাধিকার লঙ্ঘন ও শাসন-সংক্রান্ত ত্রুটিবিচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রহরীর কাজ করে সুশীল সমাজ। (২) সুশীল সমাজ নাগরিকদের অধিকার, পাওনা, সুযোগসুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করে এবং সরকারকে নাগরিকদের বক্তব্য জানায়। (৩) সুশীল সমাজ সমাজের দুর্বলতর অংশের স্বার্থ ও বক্তব্য তুলে ধরে এবং

সেগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। (৪) সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে যেসব অঞ্চল বা যেসব ব্যক্তির কাছে পৌঁছন অসম্ভব হয়, সুশীল সমাজ তাদের জন্য জনসেবামূলক কাজে যুক্ত থাকে। (৫) কোন নির্দিষ্ট নীতি বা কর্মসূচির পক্ষে বা বিপক্ষে সুশীল সমাজ জনমত সংগ্রহ করে। (৬) সামাজিক মূলধনের মাধ্যমে সুশীলসমাজ কাজ সম্পাদনে যুক্ত থাকে। সমজাতীয় ও সাম্যভিত্তিক সমাজে সামাজিক মূলধনের শক্তি বেশি হয়। সেখানে জনগণ স্বেচ্ছায় দীর্ঘমেয়াদী সাধারণ স্বার্থগুলি পরিপূর্ণ করার কাজে ব্যাপৃত থাকে।

২.৬ ভারতবর্ষে সুশীল সমাজ ও জনপ্রশাসন

ভারতবর্ষ সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে; সেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার কাছে যুক্ত থাকে। এই ব্যবস্থা জনগণের দ্বারা সরকারে পরিণত হতে পারত, কিন্তু বাস্তবে ব্যবস্থাটি জনগণ ছাড়া সরকারে পরিণত হয়েছে। সাবেকি সরকারি পরিষেবামূলক কাজসমূহের ক্রমবর্ধমান বাজারীকরণের ফলে জনগণ ও সরকারের মধ্যেকার দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে শাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে জনগণের যোগ কম দেখা যায়। জনগণ নিজেদের পরিচালনা করে না। অথচ সুশাসনের মৌলিক শর্ত হল জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ, সাম্যব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, সকলের অন্তর্ভুক্তি, আইনের অনুশাসন, দায়িত্ববোধ, কৌশলগত দূরদর্শিতা ইত্যাদি। ভারতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অনেক প্রশাসনিক কমিশন নিযুক্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের কোনটাই প্রশাসনের গুণগত উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। ইদানিং কালে তথ্য অধিকার আইন (Right to Information Act), গ্রাহক সুরক্ষা আইন (Consumer Protection Act) নাগরিকদের সনদ (Citizens Charter), তথ্যফাঁসকারীদের সুরক্ষা (Whistleblowers' Protection), বৈদ্যুতিন প্রশাসন (e-governance), গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ (democratic decentralisation), জনস্বার্থ মামলা (public interest litigation) ইত্যাদির মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার উন্নতির জন্য নাগরিকদের সুরক্ষা বা নাগরিকদের কাছ থেকে অভিযোগ (বাইরের চাপ)-কে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

আধুনিক কালের ভারতীয় সুশীল সমাজ রাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টির যথাসাধ্য উদ্যোগ নিচ্ছে, কিন্তু ভারতে সুশাসন জোরদার করার ক্ষেত্রে এখনও তাদের ভূমিকা পালন পুরোপুরি সফল হয়নি। শুধুমাত্র যেসব ক্ষেত্রে সব শ্রেণীর মানুষের সমান আগ্রহ ও স্বার্থযুক্ত থাকে, সেই সব ক্ষেত্রসংক্রান্ত বিষয়ে সুশীল সমাজ কিছুটা সফল হতে পেরেছে। ভারতের সুশীলসমাজ সংকীর্ণ গোষ্ঠী আনুগত্য ও স্বার্থের ভিত্তিতে বিভক্ত। তাই সরকার নামক বিশাল রাজনৈতিক-আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের সঙ্গে মোকাবিলা করার সামর্থ্য ভারতীয় সুশীল সমাজ এখনও অর্জন করতে পারেনি।

২০০৬-এর স্বেচ্ছামূলক ক্ষেত্রসংক্রান্ত ভারত সরকারের জাতীয় নীতি (National Policy on the Voluntary Sector)টি ভারতের স্বাধীন, সৃজনশীল ও ও কার্যকর স্বেচ্ছামূলক ক্ষেত্রকে কিছুটা উৎসাহ প্রদান করে। কিন্তু তাদের প্রতি অন্ধ ও আবেগমূলক সরকারি সমর্থন সঠিক নয়। সরকারকে তাদের সামর্থ্য, কার্যকারিতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে এবং তাদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করতে হবে। আবার যদি রাজনৈতিক শাসকের যোগ্যতা ও সামর্থ্য সন্তোষজনক না হয় তাহলে শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। ভারতের সুশীল সমাজকে বর্তমান ভারতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মান, সততা ও অঙ্গীকারবদ্ধতার অবনয়ন এবং রাজনীতির

দুর্বৃত্তায়ন সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। রাষ্ট্রকে নির্বাচনী সংস্কার ও ভোটদাতাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সুশীল সমাজকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্মক্ষমতা ও কর্মক্ষমতার অভাবকে মাঝে মাঝে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। সুশীল সমাজ সক্রিয় ভূমিকা পালন করলে তবেই ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র ভবিষ্যতে অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে পারবে।

২.৭ উপসংহার

সুশীল সমাজের বিভিন্ন কাজ ও প্রকল্পসমূহ নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, নাগরিক স্বার্থ সম্প্রসারণ বা নাগরিক প্রয়োজন পূর্ণ করা সংক্রান্ত গণবিতর্ককে উৎসাহিত করে এবং বিভিন্ন ধরনের সুশীল সমাজ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ চূড়ান্ত স্তরে রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করে গণবিতর্কের বিষয়গুলিকে আইন হিসাবে বিধিবদ্ধ করার উদ্যোগ নিতে পারে। রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সাংবিধানিক নিয়ম চালু করে, যেগুলির ভিত্তিতে গণবিতর্ক সুশৃঙ্খল ও ফলপ্রসূ হতে পারে। নাগরিক, সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া একদিকে স্থায়িত্ব এবং অন্যদিকে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে সামঞ্জস্য সুনিশ্চিত করে। যদি যোগদানকারীরা মিথষ্ক্রিয়ার শর্তগুলি পূরণ করতে না পারে, কিংবা যদি তাদের মধ্যে যোগাযোগের পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে সিদ্ধান্তগ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। তখন বৈধতার সংকট দেখা দেয়। নাগরিকরা সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিজেদের খুঁজে পায় না। ফলে দেখা দিতে পারে কর্তৃত্বের সংকট, যা আবার রাষ্ট্রের মধ্যেকার ক্ষমতা সম্পর্কের নতুন বিন্যাস ঘটাতে পারে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিন্যাস সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ দ্বারা নির্মিত হয় আর সেই আর্থসামাজিক উপাদানগুলি সৃষ্ট হয় এককভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা নতুবা রাষ্ট্রের আধিপতযুক্ত সুশীল সমাজ দ্বারা নতুবা ব্যক্তি, স্বার্থগোষ্ঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের সহযোগিতার দ্বারা। দেশের আর্থসামাজিক- রাজনৈতিক বিন্যাস কিভাবে গঠিত হয় এবং কিভাবে তা কাজ করে তার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের কাঠামো নির্ধারিত হয়।

যেসব সংগঠন ও সংস্থাসমূহ নাগরিকদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে যেগুলি সব রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বা সব সময়ে এক রকম নয়। কোন কোন দেশে সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গণমাধ্যম, ল্যাটিন আমেরিকায় তা ছিল ধর্ম, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আবার তা ছিল ছাত্র আন্দোলন। এখন নারী গোষ্ঠীসমূহ, পরিবেশ সংরক্ষণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী, শিক্ষা উন্নয়ন সংগঠন ও গোষ্ঠীসমূহ ইত্যাদি সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের ভিত্তিতে এই সব গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতায়নের প্রয়োজন আর প্রয়োজন হল সুশীল সমাজের গোষ্ঠীসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ। এগুলি বাস্তবায়িত হলেই এই গোষ্ঠীগুলি দক্ষতার সঙ্গে এবং কার্যকরভাবে তাদের কাজ পরিচালনা করতে পারবে।

২.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) জনপ্রশাসন ও সুশীল সমাজের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষিতটি ব্যাখ্যা করুন।

(২) সুশীল সমাজের অর্থ কী? সুশীল সমাজের ধারণার বিবর্তনের ওপর আলোকপাত করুন।

(৩) সুশীলসমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পারস্পরিক প্রভাবের ওপর একটি টীকা লিখুন।

(৪) ভারতবর্ষে সুশীল সমাজও জনপ্রশাসনের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ছয়টি বিভাগের কাজ সম্বন্ধে লিখুন।

(২) সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ আলোচনা করুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) সুশীল সমাজের অর্থ কী?

(২) রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ছয়টি বিভাগ কী?

(৩) সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি চিহ্নিত করুন।

(৪) সুশীল সমাজের কী উপকারিতা আছে?

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

Edwards Michael, *Civil Society*, Polity Press, Cambridge, England 2004.

Ehrchberg, John, *Civil Society*, New York University Press, New York, 1999.

Frank, Arechiarico, Administrative Culture and Civil Society, *Sage journals*.

Hayden, Rebert, Dictatorships of Virtue, *Hervard International Review*, Summer, 2002.

Holloway, John, *Challenging the world without taking power*, Pluto Press, London, 2002.

Putnam, R. D., *Making Democracy Work*, Princeton University Press, New Jersy, 1993.

World Bank, Governance and Development, Washingtone D. C., 1992.

একক-৩ ❑ বিশ্বায়ন ও জনপ্রশাসন

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ ভূমিকা

৩.৩ বিশ্বায়নের অর্থ ও সংজ্ঞা

৩.৪ বিশ্বায়নের ইতিহাস

৩.৫ বিশ্বায়নের প্রভাবসমূহ

৩.৬ বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

৩.৭ বিশ্বায়ন—সুবিধা ও অসুবিধা

৩.৮ বিশ্বায়ন ও জনপ্রশাসন

৩.৯ জনপ্রশাসনে পরিবর্তন

৩.১০ উপসংহার

৩.১১ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অবগত হবেন এবং সেগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন :

- বিশ্বায়নের অর্থ ও তার ইতিহাস।
- বিশ্বায়নের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব এবং বিশ্বায়নের উপকারিতা ও অপকারিতা।
- বিশ্বায়ন ও জনপ্রশাসনের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বিশ্বায়নের সমস্যাসমূহের মোকাবিলা করার জন্য জনপ্রশাসন দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন ধরনের কৌশলসমূহ।

৩.২ ভূমিকা

আধুনিক বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হল বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া। কখন তার উদ্ভব হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা যায় না, কারণ একশো বছর আগেও সীমিতভাবে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব ছিল। তখন উন্নত দেশের পুঁজিপতিরা

বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বাজার স্থাপন করেছিলেন। বস্তুত, পুঁজিবাদের উদ্ভব থেকেই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া কার্যকর হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের আট-এর দশকে প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরি কৌশলের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভৌগোলিক ও আইনগত সীমারেখা প্রায় মুছে গেছে আর এই সময় থেকেই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে বলা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া দ্রুতগতি লাভ করেছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলির আবির্ভাব বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে জনপ্রিয় পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য হল বিশ্বগ্রাম (Global Village) প্রতিষ্ঠা, যার মধ্যে অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, ব্যবসাসংক্রান্ত, বৈদ্যুতিন (electronic) ইত্যাদি ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতিগত, মতাদর্শগত, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত আদান-প্রদান ঘটে এবং একটি বিশ্বসমাজ, বিশ্ব শাসন ও বিশ্ব প্রশাসনের বিশেষ ধারা উদ্ভব হয়। বিশ্বায়নের ফলে সরকারি বিষয়সংক্রান্ত সব আলোচনা ও নজরের কেন্দ্র জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে স্থানান্তরিত হয়। ক্রমবর্ধিত হারে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের জটিল নেটওয়ার্কটিকে ঘিরে এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বিকাশ লাভ করে। পরিবর্তনশীল বিশ্বায়ন এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়াগুলির ক্রমবর্দ্ধমান চাপও চ্যালেঞ্জসমূহের সামনে জনপ্রশাসনের এখন হিমসিম অবস্থা ঘটেছে।

৩.৩ বিশ্বায়নের অর্থ ও সংজ্ঞা

রোল্যান্ড রবার্টসনের মতে বিশ্বায়ন হল বিশ্বের সংহতিকরণ প্রক্রিয়া এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্ববোধের অনুভূতি। মার্টিন আলব্রো মনে করেন যে বিশ্বায়ন হল বিশ্বের সমস্ত জনগণকে একটি সামগ্রিক বিশ্ব এককে পরিণত করা। বিশ্বের বিভিন্ন ধ্যানধারণা, পণ্য, দর্শন ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের আদানপ্রদান থেকে আন্তর্জাতিক একীকরণ প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে এবং পরিবহন ব্যবস্থা ও টেলিকমিউনিকেশন পরিকাঠামো (যার অন্তর্গত হল ইন্টারনেট, টেলিগ্রাফ, বেতার যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি) আন্তর্জাতিক একীকরণকে আরও জোরদার করে। এইসব প্রযুক্তিগত সুবিধাসমূহ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আগের থেকে বেশি পরস্পর-নির্ভরতার সৃষ্টি করে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF)-এর দ্বারা প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে বিশ্বায়ন হল অধিক পরিমাণে এবং অধিক সংখ্যায় পণ্য পরিষেবার আন্তঃসীমান্ত লেনদেন, মুক্ত আন্তর্জাতিক পুঁজি-প্রবাহ এবং প্রযুক্তির আরও দ্রুত ও আরও ব্যাপকতর প্রসারের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান পরস্পর-নির্ভরশীলতা। বিশ্বায়নের ওপর আন্তর্জাতিক ফোরামের মতে বিশ্বায়ন হল বিশ্বব্যাপী অতিজাতীয় কর্পোরেট ব্যবসায় ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বা জাতীয় সরকারের কাছে দায়িত্বশীল নয়, তাদের আধিপত্যযুক্ত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাম্প্রতিক উদ্যম বা প্রবণতা। ওয়ালারস্টাইন বলেছেন যে ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশকে বাদ দিয়ে আলাদাভাবে বিশ্বায়নকে অনুধাবন করা যায় না। চমস্কির মতে, বিশ্বায়ন হল একটি আন্তর্জাতিক সংহতিকরণ প্রক্রিয়া, যা বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যেসব পার্থক্য আছে, তাদেরকে যথাসম্ভব মুছে ফেলে একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা নির্মাণ করে।

বিশ্বায়নের বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলি বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণকে সর্বোচ্চ পরিমাণে উন্নীত করার জন্য ব্যক্তি, কর্পোরেশন ও সরকারের সম্পর্ক এবং ভূমিকাসমূহকে তুলে ধরে। পরিষ্কারভাবে দেখা গেছে যে

বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত দিকগুলি পরস্পর-সংযুক্ত। এই দিকগুলি আবার ব্যক্তির জীবনের বৈশিষ্ট্য ও জীবনযাত্রার ধরনের সঙ্গে যুক্ত আর তাই বিশ্বায়ন দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ জোরদার বিতর্কের সূচনা করে।

অর্থনৈতিকভাবে ব্যবসাবাণিজ্য, বিনিয়োগ, দেশান্তরগমন ইত্যাদি দ্বারা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় এবং অর্থনৈতিক পণ্য ও পরিষেবা প্রবাহের সঙ্গে তা যুক্ত থাকে। ব্যবসাবাণিজ্যের বিশ্বায়নের ফলে মানুষ নানা ধরনের পণ্য ও পরিষেবা ভোগের সুবিধা লাভ করে, যা মানুষের ইতিহাসে আগে দেখা যায়নি। জার্মান গাড়ি থেকে কলম্বোর কফি, চীনের খেলনা থেকে ইজিপ্টের তুলো, জাপানের সুশী থেকে আমেরিকার স্টারবাক্স—বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী মানুষ বিচিত্র ধরনের পণ্য ও পরিষেবা ক্রয় করতে পারে। এফ. ডি. আই. বা প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment)-এর মাধ্যমে বিনিয়োগের বিশ্বায়ন ঘটে। ফলে অতিজাতিক সংস্থাগুলি তাদের সম্পদ প্রত্যক্ষভাবে বিদেশী রাষ্ট্রে বিনিয়োগ করতে পারে কিংবা অন্য রাষ্ট্র থেকে অর্থসংক্রান্ত সম্পদ ক্রয় করতে পারে কিংবা অন্য রাষ্ট্রে পরোক্ষ বিনিয়োগ দ্বারা তাদের সম্পদ বিক্রী করতে পারে। দেশান্তরগমনের সুযোগের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শ্রমিকরা অন্য রাষ্ট্রে, যেখানে শ্রমিকের ঘাটতি আছে, সেখানে চাকরি খুঁজে নিতে পারে।

অতিজাতিক (transnational) অভিজাত গোষ্ঠীর আবির্ভাব এবং জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার অবনয়ন হল **বিশ্বায়নের রাজনৈতিক দিক**। এর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক নানা নিয়ম ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসূমহ, যারা ব্যবসাবাণিজ্য, মানবাধিকার ও পরিবেশসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে। বিশ্বায়নের ফলে এই জাতীয় যেসব নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেগুলির কয়েকটি হল আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার (IMF), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation), বিশ্ব ব্যাঙ্ক (World Bank), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) ও তার বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থাসমূহ ইত্যাদি। কোন সরকার সচেতনভাবে আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগের জন্য নিজেকে উন্মুক্ত করবে কি করবে না কিংবা কতটা করবে তা হল বর্তমানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সমাজকর্মীরা এবং অলাভজনক বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন গ্রীনপিস (Greenpeace), অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশানাল (Amnesty International) ইত্যাদিও আন্তর্জাতিক প্রকৃতিযুক্ত হয়ে পড়েছে। এই জাতীয় অনেক সংগঠন বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কিছু কিছু দিক নিয়ে চিন্তিত, কারণ তাদের আশঙ্কা হল যে অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য জাতিরাষ্ট্র হয় তার নাগরিককে অর্থনৈতিক শোষণ থেকে রক্ষা করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলতে পারে কিংবা যেসব রাষ্ট্র নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে তাদেরকে সমর্থন করতে পারে।

বিশ্বায়নের ফলে **সংস্কৃতিগত দিকে** আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। ব্যবসাবাণিজ্য, ভ্রমণ, প্রচারযন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে পণ্য পরিষেবা, নতুন ধ্যানধারণা, আদর্শ, গান, কবিতা ইত্যাদির আদান-প্রদান ঘটে এবং সেগুলি তড়িৎগতিতে বিশ্বময় প্রসারিত হয়। আন্তর্জাতিক নামী সংস্থা, যেমন কোকা কোলা, নাইকি বা সোনি বিশ্বব্যাপী উপভোক্তাদের কাছে সমভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভারতে বসবাসকারী এক ব্যক্তি আর আমেরিকায় থাকা এক ব্যক্তি একইভাবে সেগুলি উপভোগ করে।

প্রযুক্তিবিদ্যার বৈপ্লবিক পরিবর্তন (বিশেষত **পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে** এবং তথ্য প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের এলাকায়) বর্তমানে একটি বৈশ্বিক গ্রাম (Global village) সৃষ্টি করেছে বলে দাবী করা হয়। ১৯৫০

সালে জলপথে বিশ্বভ্রমণে এক বছর সময় লেগেছিল। এখন আকাশপথে একদিনেই বিশ্বভ্রমণ করা যায়। তাছাড়া বিশ্বের যে কোন প্রান্তে এক মুহূর্তের মধ্যে ইমেলে বক্তব্য জানানো যায়, এক বিলিয়ন দর্শকের সঙ্গে দূরদর্শন বা কম্পিউটারের সামনে বসে বিশ্বের যে কোন জায়গা থেকে একসঙ্গে বিশ্বকাপ ক্রিকেট ম্যাচের ফাইনালের খেলা উপভোগ করা যায়। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে পরিবহনের জন্য ব্যয় অনেক কমে যাওয়ায় দেশীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিভিন্ন দেশের বিদেশী বাজার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। সস্তায় টেলিকম ও ভ্রমণ সম্ভব হওয়ায় আন্তর্জাতিক লেনদেন ও মিথষ্ক্রিয়া অসম্ভব হারে বৃদ্ধি পেয়েছে—ইতিহাসে যা নজিরবিহীন বলা যায়। উত্তর আটলান্টিকের টুনা মাছ ধরে পরের দিনই তা এশিয়া বা আফ্রিকার কোন রেস্তোরাঁয় পরিবেশন করা যায়। প্রতিদিন প্রায় কোন খরচ ছাড়াই বৈদ্যুতিন উপায়ে লক্ষ লক্ষ ডলারের (সম্পদ ও মুদ্রায়) আদান প্রদান হয়। বিশ্বায়ন সর্বক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করছে—অর্থনীতি, প্রযুক্তি, সাংস্কৃতিক বিষয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক, পরিবেশও মতাদর্শগত উপাদান ইত্যাদি।

বিশ্বায়ন, যা অনেক সমস্যা ও পরিবর্তনের কারণ, তাকে আবার পরিবর্তনের সমার্থক মনে করা হয়। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে মূলধন প্রবাহের চারটি মৌলিক রূপই বিশ্বায়নের সৃষ্টি করে—

(১) মানব মূলধন (অভিবাসন বা immigration, দেশান্তরগমন বা migration, প্রবাস, নির্বাসন, আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ইত্যাদি)

(২) আর্থিক মূলধন (সাহায্য, বিনিয়োগ, ঋণ, ইকুইটি ফান্ড, আমানত)

(৩) সম্পদ মূলধন বা resource capital (ব্যক্তি, ধাতু, খনিজ আকরিক)

(৪) ক্ষমতা মূলধন বা power capital (নিরাপত্তাবাহিনী, জোটবন্ধন, সশস্ত্র বাহিনী)

চার ধরনের পরস্পর সংযুক্ত পেশাগোষ্ঠী—(i) সাংবাদিক, (ii) গ্রন্থাগারিক, (iii) শিক্ষক ও গবেষক এবং (iv) প্রকাশক ও সম্পাদকদের সম্মিলনের ফলে বিশ্বায়নের ধারণার উদ্ভব ঘটে। ২০০০ সালে আই.এম.এফ. (IMF) বিশ্বায়নের চারটি দিকের কথা বলে—ব্যবসা ও বাণিজ্য, মূলধন ও বিনিয়োগ প্রবাহ, দেশান্তরগমন ও জনগণের যাতায়াত এবং জ্ঞানের বিতরণ ও প্রচার। পরিবেশসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ, যেমন বিশ্ব উষ্ণায়ন, আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ, জলদূষণ, সমুদ্রে অতিরিক্ত মৎসশিকার ইত্যাদি বিশ্বায়নের সঙ্গে যুক্ত। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া একদিকে ব্যবসা সংগঠন, অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে, অন্যদিকে সেগুলি দ্বারা আবার বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া প্রভাবিতও হয়।

বিশ্বায়ন হল একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, যা জনগণ, প্রতিবেশী গোষ্ঠী, শহর, অঞ্চল, দেশ ইত্যাদিকে অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ করে—যা আগে দেখা যায়নি। আধুনিক মানুষের জীবন বিশ্বের অন্যান্য মানুষের জীবনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত, কারণ যে খাদ্য তারা খায়, যে সঙ্গীত তারা উপভোগ করে, যে তথ্য তারা সংগ্রহ করে এবং যেসব ধারণা ও আদর্শ তারা পোষণ করে, সেগুলি বিশ্বের সর্বত্রই একরকম। বিশ্বের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের ফলে এখন জাতীয় রাষ্ট্রের সীমারেখার গুরুত্ব অনেক কমে গেছে এবং বিশ্ব একটি সমজাতীয় ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বলে দাবী রাখে।

৩.৪ বিশ্বায়নের ইতিহাস

বিশ্বায়নকে সাধারণভাবে সাম্প্রতিক ঘটনা বলে মনে করা হয় এবং অষ্টাদশ শতক বা জ্ঞানদীপ্তির যুগ থেকে

এর সূচনা ঘটেছিল বলে মেনে নেওয়া হয়। এই সময়েই আধুনিকতার ধারণারও উদ্ভব ঘটে। কিন্তু হঠাৎ করে বিশ্বায়নের সৃষ্টি হয়নি। বিশ্বায়নের সুদীর্ঘ ও ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। হাজার বছর ধরে মানুষ বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করেছে। ফলে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে মেলামেশা বেড়ে গেছে। সিল্ক রোড স্থলপথে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপকে বহুদিন আগেই যুক্ত করেছিল। এই ব্যবস্থাটি হল আন্তঃসীমান্ত ভ্রমণের অন্যতম উদাহরণ এবং প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত স্থানীয় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে বিভিন্ন যোগাযোগের ভিত্তিতে সামাজিক রূপান্তরের নজির। এই যোগাযোগের ফলে ভাষা, ধর্ম, দর্শন, শিল্পকর্ম এবং সংস্কৃতির অন্যান্য দিকগুলি প্রসারলাভ করে এবং তা মিশ্রিত রূপ ধারণ করে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপীয়রা তাদের সহযোগের অভিযানের সময়, বিশেষত অ্যাটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকার নতুন বিশ্বে ভ্রমণের সময় গুরুত্বপূর্ণ নানা আবিষ্কার করে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়—প্রথমে পর্তুগীজ ও স্পেনীয় এবং পরে ব্রিটিশ ও ডাচ সাম্রাজ্য। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে বিশ্ববাণিজ্যের উন্নয়ন, মানুষের বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপ এবং পণ্যদ্রব্য ও ভাব বা ধ্যানধারণাসমূহের বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ ঘটে। অষ্টাদশ শতকে হয় শিল্প বিপ্লব আর ঊনবিংশ শতকে দেখা যায় শিল্পে উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন এবং নতুন ধরনের পরিবহন ব্যবস্থা—রেলপথ, বাষ্পচালিত ট্রেন ও জাহাজ এবং টেলিকম ব্যবস্থা—টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন। এগুলি ক্রমবর্ধিতভাবে এবং দ্রুত গতিতে বিশ্বব্যাপী আদানপ্রদান সম্ভব করে। ফলে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ও বিংশ শতকে বিশ্ব অর্থনীতি ও সংস্কৃতি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে পড়ে। উন্নত রাস্তা, যানবাহন, আকাশ পথের জন্য এরোপ্লেন, জলপথের জন্য জাহাজ, স্থলপথের জন্য ট্রেন, ভ্যান, গাড়ি ইত্যাদি এবং ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, মোবাইল, ইন্টারনেট, ইমেল ইত্যাদির আবির্ভাব হয়। বিংশ শতকের শেষ দিকে এগুলি ব্যবসা, বাণিজ্য ও সম্পর্কসূত্রে লক্ষ লক্ষ মানুষকে একীভূত করে। অর্থাৎ বিশ্বায়ন হল নিরন্তর ও ধারাবাহিকভাবে বিকশিত প্রক্রিয়া।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে সৃষ্ট হয় উদারীকরণ, যার বৈশিষ্ট্য হল নব্যধ্রুপদী অর্থনৈতিক মডেল। এই মডেলের ভিত্তি হল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে পণ্য ও পরিষেবার অবাধ প্রবাহ। এর ফলে দেখা যায় বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রে রপ্তানি ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ প্রবণতা এবং সংরক্ষণমূলক শুল্ক ও বাণিজ্যের অন্যান্য বাধাসমূহ অপসারণের জন্য প্রবল চাপ। ঊনবিংশ শতকের উদারীকরণ ছিল বিশ্বায়নের প্রথম ধাপ, যা শিল্পায়নের জন্ম দেয়। এই যুগের তত্ত্বগত ভিত্তি স্থাপন করে ডেভিড রিকার্ডোর তুলনামূলক সুবিধা ও সাধারণ ভারসাম্যের নিয়ম সংক্রান্ত কাজ। বলা হয় যে জাতিরাষ্ট্রগুলি স্বাধীন পরিবেশে কার্যকরভাবে ব্যবসা করবে এবং যোগান বা চাহিদার ক্ষেত্রে সাময়িক ব্যাঘাত ঘটলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেদের সংশোধন করে নেবে। ১৮৫০ থেকে ১৮৮০-র মধ্যে মুখ্য শিল্পপ্রধান জাতিরাষ্ট্রগুলিতে স্বর্ণমান ধাপে ধাপে প্রবর্তিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দ্রুততর গতিতে বিশ্বায়নের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। এই যুগের বিশ্বায়ন GATT বা গ্যাটের আওতাধীনে বাণিজ্য আপস চক্র দ্বারা চালিত হয়, যার ফলে অবাধ বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণের অপসারণের জন্য বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদিত হয়। জাতিসমূহের অর্থবৃদ্ধির অনুকূলে কাজ করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আই.এম.এফ. সৃষ্ট হয়। উরুগুয়ে আলোচনার পর ১৯৭০ সালে চুক্তি দ্বারা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) গঠন করা হয় বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য। অবাধ বাণিজ্যের সমর্থনে অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়; ইউরোপের মাসট্রিক্ট চুক্তি ও উত্তর আমেরিকার অবাধ বাণিজ্য চুক্তি দুটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ধীরে ধীরে বহুজাতি সংস্থাসমূহ বা MNC-দের আবির্ভাব হয়। তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল জেনারেল মোটরস, ফোর্ড মোটর, টয়োটা, ইত্যাদি যানবাহন উৎপাদনকারী কোম্পানী, সামসুং, এল.জি., সোনি ইত্যাদি ইলেকট্রনিক কোম্পানি এবং ম্যাকডোনাল্ড, কাফে কফিডে ইত্যাদি ফাস্ট ফুড কোম্পানি।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিরাষ্ট্রের ক্ষমতা কমতে থাকে। অতিজাতিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ ঘটে—যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), জি-৮, ইউরোপীয়ান কমন মার্কেট (EEC), নাফটা (NAFTA)। তাছাড়াও আবির্ভাব ঘটে এক ঝাঁক অসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের (NGO), যেগুলি জাতীয় আইন ও নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ হলেও আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করতে থাকে। আন্তর্জাতিক মানচিত্র কয়েকটি সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্র থেকে বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ জগতে পরিণত হয়।

৩.৫ বিশ্বায়নের প্রভাবসমূহ

বিশ্বায়নের প্রভাব একদিকে আমেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে এবং অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের সব দেশগুলিতেই অনুভূত হয়। তাদের মধ্যে অনেকগুলি বৃদ্ধি ও বিকাশের সহায়ক, অনেকগুলি আবার নয়।

(i) ইউরোপ ও আমেরিকার ওপর প্রভাব

বিশ্বায়নের ফলে আমেরিকা ও ইউরোপের অর্থনীতিতে, বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক বাজার রাজনীতিতে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এইসব পরিবর্তনগুলি আবার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা পরিবর্তনের সূচনা ঘটিয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনীতি এখন বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে নতুন ধরনের বিভিন্ন ব্যবস্থা ও বিন্যাস দেখা দিয়েছে, যাদের কয়েকটি হল—

(১) অবাধ বাণিজ্য এলাকা :

এটি হল কিছু দেশের মধ্যে চুক্তি যা আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা ও নিয়ন্ত্রণসমূহ অপসারণের কথা বলে।

(২) কাস্টমস্ ইউনিয়ন :

এর সদস্যরাষ্ট্ররা নিজেদের মধ্যে ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় বাধা বা প্রতিবন্ধকতাসমূহকে দূর করে অভিন্ন বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করে।

(৩) ইউরোপীয় কমন মার্কেন্ট :

১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারী ফ্রান্স, জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় রিপাবলিক, ইটালী, বেলজিয়াম, নেদ্যারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ—এই ছটি দেশকে নিয়ে এটি গঠিত হয়। পরে এর সদস্য সংখ্যা হয় পনেরো। এর সব সদস্যই হল ইউরোপীয় রাষ্ট্র এবং সকলেই গণতান্ত্রিক প্রকৃতিসম্পন্ন। এই সংস্থার কাজগুলি হল—

(ক) পণ্যদ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে কাস্টম ডিউটি ও পণ্যদ্রব্যের পরিমাণের নিয়ন্ত্রণকে অপসারিত করা।

(খ) সাধারণ পরিবহন নীতিরচনা।

(গ) সাধারণ কৃষিসংক্রান্ত নীতি পরিকল্পনা।

(ঘ) ঋণ পরিশোধের হিসাবের (balance of payment) ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতার নিয়ন্ত্রণ।

(ঙ) সাধারণ বাণিজ্য নীতির বিকাশ।

(৪) উত্তর আমেরিকার অবাধ বাণিজ্য চুক্তি (NAFTA) :

এই চুক্তিটি ১৯৯৪ সালে সম্পাদিত হয়। এর সদস্য হল দুটি উন্নত রাষ্ট্র—আমেরিকা ও কানাডা এবং একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র—মেক্সিকো। এর কাজগুলি হল—

(ক) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত বাধাসমূহের অপসারণ।

(খ) শিল্প বিকাশের গতি বৃদ্ধি করা।

(গ) প্রতিযোগিতার সুযোগ বাড়ানো।

(ঘ) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের উন্নতিসাধন।

(ঙ) মেক্সিকোর শিল্পায়নের গতির বিকাশ ঘটানো।

(৫) ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংস্থা (European Free Trade Association) :

১৯৫৯ সালে এটির উদ্ভব হয়। এর সদস্য-রাষ্ট্রগুলি হল অস্ট্রিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড ও গ্রেট ব্রিটেন। এর কাজগুলি হল—

(ক) বাণিজ্য সংক্রান্ত বাধার দূরীকরণ।

(খ) শুল্কসমূহের অপসারণ।

(গ) অবাধ বাণিজ্যকে উৎসাহপ্রদান।

(ঘ) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি।

(ii) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ওপর প্রভাব

আধুনিক পটভূমিতে তৃতীয় বিশ্ব শব্দটির কোন গুরুত্ব নেই। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব নামে পরিচিত ছিল। উভয়েই বৃহৎ শক্তি হিসাবে পরিগণিত হত। বিশ্বের অধিকাংশ দেশই তাদের যেকোন একজনের সঙ্গে জোটবদ্ধ ছিল। উভয়ের মধ্যে কারো সঙ্গেই কোন জোট যুক্ত ছিল না, এমন সব জোটনিরপেক্ষ দেশগুলিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশ বলা হত। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় বিশ্ব অন্তর্হিত হয়। কিন্তু তাও জোটনিরপেক্ষ দেশগুলিকে এখনও তৃতীয় বিশ্ব নামে অভিহিত করা হয়।

তৃতীয় বিশ্বের ওপর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাবজনিত পরিবর্তনগুলি হল—

(১) সার্ক : এশিয়ার বাণিজ্য ব্লক হিসাবে আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য দক্ষিণ এশীয় প্রতিষ্ঠান (South Asian Association for Regional Cooperation বা SAARC) ১৮৮৩ সালে গঠিত হয়। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ ছিল এর সদস্য। পরে আফগানিস্তান ও নেপাল এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

এর উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াকলাপগুলি হল—

(ক) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটানো।

(খ) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির জনগণের জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি।

(গ) অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি।

(ঘ) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

(ঙ) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত উদারীকরণ নীতি গ্রহণ।

(২) চীনের বাজার : প্রথমে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির প্রবর্তন করলেও পরে কমিউনিষ্ট চীন অনেক অর্থনৈতিক সংস্কার গ্রহণ করে এবং ১৯৮৪ সালে বেসরকারিকরণ নীতিকে সমর্থন জানায়। চীন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zones) গঠন করেছে এবং বিশাল পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করেছে। চীনের প্রতি শহরে এবং প্রতি নগরে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অঞ্চল গঠিত হয়েছে। এই অঞ্চলগুলি স্বাধীন এবং সেখানে দ্রুতগতিতে ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা করা হয়।

(৩) জাপানী বাজার : গত পঞ্চাশ বছরে জাপানের অর্থনীতির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। জাপানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রক জাপানের কর্পোরেট ক্ষেত্রগুলির নীতি ও কৌশলসমূহকে নির্দেশিত করে।

(৪) ভারতের ওপর প্রভাব : ভারতীয় অর্থনীতি ও বিশ্বায়ন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ভারত সক্রিয়ভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে এবং ভারতের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক আদানপ্রদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বায়ন-উত্তর ভারত টেলিকম, তথ্যপ্রযুক্তি, গবেষণা, উৎপাদনশীলতার বিকাশ, অবাধ বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক সুযোগসুবিধা প্রদান করে। ভারত এখন WTO-র সদস্য আর এই WTO হল বিশ্ববাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক। উদারীকৃত অর্থনীতির শর্ত ও প্রয়োজন যাতে পূর্ণ হয়, সেজন্য ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়সংক্রান্ত আইনসমূহের সংশোধনও করা হচ্ছে, যেমন ফেমা (FEMA)। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলে বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

৩.৬ বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিশ্বায়ন হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংহতিসাধন, আর্থিক আদানপ্রদান, বাণিজ্যিক সহযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া। অনেকে অবশ্য বিশ্বায়নকে অর্থনৈতিক ধারণা হিসাবেই দেখেন। তাঁদের মতে, বিশ্বায়ন হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন বা পুঁজি ও প্রযুক্তির আদানপ্রদান। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত। বিশ্বায়ন হল আজকের পরস্পর-নির্ভরশীল বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবেশের মূল ভিত্তি। এখন তথ্য ও অর্থ আগের থেকে অনেক বেশি দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হয়। দেশের এক অংশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ও পরিষেবা এখন বিশ্বের অন্যান্য অংশে ত্বড়িৎগতিতে পৌঁছে যায়। আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এখন প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে পণ্যসামগ্রী, অর্থ, তথ্য, মানুষ

ইত্যাদির যাতায়াত, যোগাযোগ ও মিথষ্ক্রিয়া ক্রমবর্দ্ধমান আর সেই প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার জন্য প্রযুক্তিগত সংস্থা, আইনি সংগঠন ও নানা পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে।

প্রথমত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তির ভিত্তিতে সৃষ্ট হয়েছে ওপেক (OPEC), ডব্লিউ.টি.ও (WTO), আই.এম.এফ. (IMF) ইত্যাদি সংস্থাসমূহ। তাদের ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক বহুজাতিক সংস্থা (MNC)ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান, বহু-সাংস্কৃতিকতার প্রসার, সাংস্কৃতির বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিতির সুযোগ ইত্যাদি অনেক বেড়ে গেছে। হলিউড ও বলিউড সিনেমার রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আশংকা থাকছে যে, আমদানিকৃত বিদেশী পশ্চিমী সংস্কৃতি উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশের স্থানীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে এবং সংস্কৃতির পশ্চিমীকরণ সৃষ্টি করতে পারে। অধিকসংখ্যায় বিদেশভ্রমণ এবং ভ্রমণ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে অভিবাসন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেআইনি অভিবাসনও বৃদ্ধি পেতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পশ্চিমী খাবার, যেমন পিজা, চীনা চাওমিন ইত্যাদি এবং পশিচমী পপসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়সমূহ প্রসারিত হলে সেই দেশগুলির অধিবাসীদের চিরকালীন অভ্যাস ও জীবনযাত্রার ধারার পরিবর্তন ঘটতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিদেশী বুলির, বিশেষত ইংরেজীর ব্যবহার ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। ফলে এখন ওই সব দেশের বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রবলভাবে সেগুলির ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। অনেকে আবার ভালভাবে সেই ভাষা না জেনেই সেগুলি ব্যবহার করে।

তৃতীয়ত, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদির ব্যবহারের ফলে বিশ্বব্যাপী পরিকাঠামোর উন্নয়ন হয়েছে এবং আন্তঃসীমান্ত তথ্যপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। কপিরাইট ও পেটেন্ট আইন এখন আন্তর্জাতিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, বৌদ্ধিক সম্পত্তিসংক্রান্ত আইনও একইভাবে কার্যকর হয়। সন্ত্রাসবাদেরও বিশ্বায়ন ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে গ্যাট চুক্তির মাধ্যমে। গ্যাট অবাধ বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে, শুল্ক কমিয়ে দেয় বা অপসারিত করে অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল নির্মাণ করে, যেখানে শুল্ক হয় খুব কম থাকে নতুবা আদৌ তা থাকে না। বিভিন্ন ধরনের অবাধ বাণিজ্য অঞ্চলগুলি হল—

(১) বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zone বা SEZ) : এই সব অঞ্চলে কর সংক্রান্ত আইন বা কাস্টম ডিউটি সংক্রান্ত নিয়ম জাতীয় আইনের তুলনায় অনেক বেশি সহজ ও উদার। এর মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েক ধরনের অঞ্চল থাকতে পারে—

(i) স্বাধীন বাণিজ্য অঞ্চল (Free Trade Zones বা FTZ) : এইসব অঞ্চলে পণ্য দ্রব্য নামাতে, উৎপাদন করতে বা পুনরায় রপ্তানি করতে কোন বাধা নেই। সংশ্লিষ্ট জাতীয় রাষ্ট্র কোন হস্তপেক্ষ করতে পারে না। এই অঞ্চলগুলি থেকে পণ্যদ্রব্য যখন অন্য অঞ্চলে যায় তখন তা শুল্ক ও কাস্টম ডিউটির অধীন হয়ে পড়ে। এই অঞ্চলগুলি সাধারণ ভৌগোলিক দিক থেকে সুবিধাজনক স্থান, যেমন নদী বা সমুদ্র তীরস্থ বন্দর বা বিমানবন্দরে কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি হল এমন একটি অঞ্চল, যেখানে কিছু দেশ বাণিজ্য সংক্রান্ত বাধা কমানো বা দূরীকরণের জন্য একত্রিত হয়।

(ii) স্বাধীন অঞ্চল বা মুক্ত সীমান্ত : এগুলি হল ট্রেড ব্লক অঞ্চল, যেখানে বাণিজ্য চুক্তির ভিত্তিতে কিছু রাষ্ট্র শুল্ক বা আমদানি কোটা তুলে দেয়। লোকেরা যদি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, তখন সেই অঞ্চলকে মুক্ত সীমান্ত বলা হয়—যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

(iii) শিল্প পার্ক বা বৈশিষ্ট্যযুক্ত শিল্প অঞ্চল : জর্ডন বা ইজিপ্টে অবস্থিত শিল্প পার্কগুলি ব্যবসায়ীদের আমেরিকা ও ইস্রায়েলের অবাধ বাণিজ্য চুক্তির সুবিধাগ্রহণকে অনুমোদন করে।

(২) এশিয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা (Asia Pacific Economic Cooperation) : এটি হল বিশ্বের সবথেকে সুসংহত বাণিজ্য অঞ্চল। এই অঞ্চলের সমস্ত আমদানি ও রপ্তানির ৫০% থেকে ৬০% আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য এখানে সম্পাদিত হয়।

(৩) ট্যাক্স হাভেন : এটি হল একটি দেশ বা এলাকা, যেখানে নির্দিষ্ট কিছু কর বা শুল্ক কম হারে ধার্য্য করা হয় কিংবা আদৌ ধার্য্য করা হয় না। এর আইনসমূহ কর বা নিয়ম বা অন্যান্য এক্তিয়ার এড়িয়ে চলতে বা তাদের থেকে দূরে থাকার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সব ট্যাক্স হাভেনে অনেক সময় অলস নগদ অর্থের পুঞ্জিভবন ঘটে। এই নগদ অর্থ বিভিন্ন সংস্থার পক্ষে ব্যয়বহুল বা অকার্যকর বলে পরিগণিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এগুলির সঙ্গে জালিয়াতি, অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসবাদের সংযোগ থাকে।

(৪) কালোবাজার ও বহুজাতিক সংস্থাসমূহ : এগুলি বহুজাতিক সংযোগের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং প্রায়শই অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ২০১০ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ড্রাগ ও অপরাধ অফিস (UN Office on Drugs and Crime) জানায় যে আন্তর্জাতিক ড্রাগ ব্যবসা থেকে প্রতিবছর ৩২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব হিসাবে আয় হয় এবং হিরোইন, কোকেন ইত্যাদিতে আসক্ত ৫০ লক্ষ ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। বিপন্ন প্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চোরাচালান কারবার দেখা যায়। সিন্ধু ঘোটক বা গন্ডারের শিঙ বা বাঘের হাড় বা কনুই বা কৃষ্ণসার হরিণের শিঙ ইত্যাদি নিয়ে শিকারীদের চোরাচালান ব্যবসা চলে।

বিশ্বায়নের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি হল জাতিরাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস ও অতিজাতিয়তার গুরুত্ব বৃদ্ধি :

বিশ্বায়ন জাতীয় রাষ্ট্রের গুরুত্ব হ্রাস করছে এবং অতিজাতীয় সংস্থাসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি করছে, যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জি-৮, আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল কোর্ট, আন্তর্জাতিক বিচারালয় ইত্যাদি, যেগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তির সহায়ক। জাতি-রাষ্ট্রের ভূমিকা এখন সামান্য হয়ে গেছে। মানবিক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির (NGO) গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বপ্রেম বা মানবপ্রীতির বিকাশের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলি গুরুত্ববহ হয়ে পড়েছে। তারা বাণিজ্য মডেলের সঙ্গে মানবপ্রেমকে যুক্ত করছে। ব্যবসার মডেলে আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্ব মানবপ্রেম ফোরাম (Global Philanthrophy Forum) বা গোষ্ঠীসমূহ মানবপ্রীতির কাজকর্ম পরিচালনা করছে। তবে কোন কোন দেশ আবার বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বের নীতি গ্রহণ করে চলেছে। তারা আঞ্চলিক গোষ্ঠী বা ফোরামসমূহের বেসরকারি ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংযুক্ত নয়।

বিশ্বায়ন-বিরোধিতা

অনেক জায়গায় আন্তর্জাতিকতা বিরোধী কিছু কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। অনেক দেশেই বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে, প্রচারমাধ্যমে তাদের বক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে, তারা অসরকারি প্রতিষ্ঠান (NGO), ফেসবুক, টুইটার

ইত্যাদির মাধ্যমসমূহের সাহায্য নিচ্ছে এবং বিক্ষোভ সমাবেশ করছে। এ জাতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হল সিয়াটলের যুদ্ধ (Battle of Seatle), ১৯৯৯, যা জনগণকে বিশ্বায়নের সমস্যাসমূহ সম্পর্কে সচেতন করে এবং WTO, IMF, G-8 বা বিশ্ব ব্যাংকের অফিসের সামনে বিশ্বায়ন-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তবে এইসব দুর্বল প্রতিবাদ আন্দোলন সত্ত্বেও বিশ্বায়ন এখনও পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলেছে।

৩.৭ বিশ্বায়ন—সুবিধা ও অসুবিধা

বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি, ইন্টারনেট ইত্যাদির অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে, যার ফলে আন্তর্জাতিক সংহতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরস্পর-নির্ভরশীল বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। বিভিন্ন দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলি পণ্যদ্রব্যের গুণগত ও পরিমাণগত মানের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বিশ্বায়ন বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাগুলিকে অপসারিত করেছে এবং বিভিন্ন দেশের পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাকে উন্নততর করেছে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং পরিষেবার ক্ষেত্রে মানের উন্নতি করেছে আর জাতিরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে যুক্ত করেছে। এখন বাণিজ্যসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ ও আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। সমাজকর্মী, সাংবাদিক ও শিক্ষক-অধ্যাপকগোষ্ঠী বিশ্বজুড়ে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ লাভ করেছে। বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির আদানপ্রদান ঘটেছে এবং একটি মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে বিবিধের মধ্যে এই মিলন স্বাভাবিকভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ।

তবে বিশ্বায়নের কিছু সমস্যা ও ত্রুটি অবশ্যই আছে। বিশ্বায়ন বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য বৃদ্ধি করেছে। উন্নত দেশগুলির পক্ষে বিশ্বায়নের প্রভাব অনুকূল ছিল, কোন কোন উন্নয়নশীল দেশ, যেমন চীনেরও অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সব উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। অনেকেই ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্বায়ন অনেক নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেনি। উন্নয়নশীল দেশগুলির কৃষকরা কৃষিশিল্পসমৃদ্ধ সংস্থাসমূহের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সামনে অসহায় হয়ে পড়েছে। উন্নত দেশগুলির সস্তায় উৎপন্ন কৃষিপণ্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জড় করা হচ্ছে। পৃথিবী ব্যাপী মানুষের ভ্রমণ, পণ্যদ্রব্যের যাতায়াত বৃদ্ধি, নানারকম যানবাহন ও গাড়ীর চলাচলের গ্যাস নির্গমন বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত দেশগুলি নানাভাবে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আর্থিক দিক থেকে শোষণ করে চলেছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত কোন কোন প্রকল্প অনেক উন্নয়নশীল দেশের পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে—পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। বিশ্বায়নের পিছনে প্রধান শক্তি হল বহুজাতিক অসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বা MNCগুলি। তারা বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অর্থনীতির বিশেষ কোন দিকে উন্নয়নের জন্য বাধ্য করছে। তারা কর্পোরেট সংস্থা হিসাবে অসম্ভব শক্তি অর্জন করেছে এবং অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদকে হয় শোষণ করছে, নয় ধ্বংস করছে। বিশ্বায়ন জাতীয় সার্বভৌমিকতার ক্ষেত্রে বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এর ফলে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব স্বাধীন রাষ্ট্রের হাত থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে সংস্থাগুলির কাছে হস্তান্তরিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, কারণ এখন সব দেশের সরকারি নীতিসমূহই বিশ্বায়নের অনুকূলে আন্তর্জাতিকভাবে স্থিরীকৃত হয়।

বিশ্বায়নের তাৎক্ষণিক প্রভাব হল উদারীকরণ, যার অর্থ অবাধ বাণিজ্য। উদারীকরণ অবাধ বাণিজ্যের ওপর যাবতীয় বিধিনিষেধের অপসারণের প্রস্তাব করে। এর ফলে আসে বেসরকারিকরণ, যার সমর্থক হল সরকারি সংস্থাগুলির মালিকানা বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তরকরণ, যা হল IMF দ্বারা নির্দেশিত কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির অনিবার্য ফল। বিশ্বায়ন অনেক সময় অস্থায়িত্ব নিয়ে আসে। বিশ্বায়ন দ্বারা সৃষ্ট বিশ্ববাজার হল যুক্তিবর্জিত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা যে কোন সময়ে মুদ্রার বিনিময় হার, সুদের হার, বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আকস্মিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অস্থায়িত্ব এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক অংশের জনগণের দুর্বলতা ও অসহায়তা অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। বিশ্বায়নকে তাই অনেকে দরিদ্রদের স্বার্থবিরোধী ব্যবস্থা বলে মনে করেন। বিশ্বায়নের প্রথম পর্বে ১৯৮৭-৮৯ সালের মধ্যে আফ্রিকার সাবসাহারা অঞ্চলে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে দরিদ্র ব্যক্তিদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে আমেরিকা ও ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সম্পদ ও পুঁজির বহুগুণ বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বায়নের মাধ্যমে ধনী দেশগুলি আরও ধনী এবং দরিদ্র দেশগুলি আরও দরিদ্র হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিকে বিশ্বায়নের আওতায় এনে উন্নত রাষ্ট্রগুলি নিজেদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করছে আর চোখধাঁধানো প্রচারের ফাঁদে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি অসহায়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এই দেশগুলির ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পগুলি আগে উন্নত ছিল। কিন্তু বিশ্বায়নের বাজারে টিকে থাকতে না পেরে তারা হারিয়ে যাচ্ছে আর উন্নত দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিশ্বায়নের ফলে শুধু বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পদবৈষম্য যে বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, অপরাধ প্রবণতাও বেড়ে গেছে। অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন, অপরাধমূলক কাজে যোগদান, মাদক দ্রব্য ও অন্যান্য নেশার ব্যবহার বৃদ্ধি, বেআইনি দ্রব্য পাচার, জাল নোট ছাপানো, আন্তঃসীমান্ত চোরাচালান ইত্যাদিও এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রবেশ করছে। তা ছাড়াও সন্ত্রাসমূলক কাজের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সন্ত্রাসবাদ এখন কোন দেশের সীমানায় বন্দী নয়। সমগ্র বিশ্বে তা ছড়িয়ে গেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ অনেক সাইবার ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে।

বিশ্বায়ন শব্দটির অর্থ ব্যাপক ব্যঞ্জনযুক্ত। কিন্তু অনেকে বিশ্বায়নের বদলে আন্তর্জাতিকীকরণ শব্দটি পছন্দ করেন, কারণ আন্তর্জাতিকীকরণ শব্দটির মধ্যে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও জাতির গুরুত্বকে অস্বীকার করা হয় না, কিন্তু বিশ্বায়ন শব্দটি রাষ্ট্র ও জাতি উভয়কেই অপসারিত করে। আজকের বিশ্বে যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন, তাঁদের মতে, রাষ্ট্র এখনও অদৃশ্য হয়নি। অনেকে আবার বিশ্বায়নকে প্রকৃত ঘটনার বদলে বিশ্লেষণের জন্য সৃষ্ট অতিকথা বলে গণ্য করেন।

তবে তর্কের খাতিরে যাই বলা যাক না কেন, আমাদের মানতেই হবে যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বিশ্বের বাণিজ্যের ধরন এবং সেই সঙ্গে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে। বিশ্বায়ন আজকের যুগের অপরিহার্য ও অপ্রতিরোধ্য। বিশ্বায়ন শুধু আজকের রীতি নয়, ভবিষ্যতেরও প্রবণতা।

৩.৮ বিশ্বায়ন ও জনপ্রশাসন

বিশ্বায়নের ফলে সরকার, রাজনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, প্রশাসন, জনপ্রশাসন, সুশীল সমাজ-রাষ্ট্র সম্পর্ক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। পরিচালনা সংক্রান্ত দর্শন, প্রশাসনিক বিষয়, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি সংক্রান্ত অনেক পুরনো ও সনাতন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। প্রশাসনের সনাতন

কাঠামোগত রূপ ও বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। বলা যায় যে আধুনিককালের নতুন বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় প্রচলিত শিল্পসমাজের দ্রুত পতনের সময় থেকে আর এই নতুন বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বিশ্বের অনেক দেশই প্রাণপণ প্রচেষ্টা করে চলেছে। কয়েকটি দেশের অগ্রগতি ও বৃদ্ধি ঘটেছে দ্রুতগতিতে, কিন্তু অধিকাংশ দেশই বেঁচে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে সংগ্রামে রত থাকছে। বিশ্বব্যাপী সংগঠিত এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সমস্ত সমাজ, জনগণ সরকার, জনপ্রশাসন ব্যবস্থা ইত্যাদিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করছে।

পরিবর্তন যে প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য সকলেই তা মানেন। কিন্তু বিশৃঙ্খলাযুক্ত পরিবর্তন কখনোই কাম্য নয়। তাছাড়াও সমাজ, সরকার ও মানবতার পক্ষে পরিমাণগত পরিবর্তনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু গুণগত পরিবর্তন মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন বা বহুকাল ধরে প্রচলিত বৈশিষ্ট্যসমূহের নবরূপ নিয়ে আসে। বর্তমান বিশ্বে বিশ্বায়নের নামে ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন ঘটছে—ফলে জাতীয় সমাজ ও সম্প্রদায় এবং বিশ্ব নবরূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

বিশ্বায়ন কিছু পরিমাণে আন্তঃরাষ্ট্র পারস্পরিক-নির্ভরশীলতার সৃষ্টি করে, যা শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের সহজ সরল ব্যাপার নয়। অতীতে জাতীয় অর্থনীতির আন্তর্জাতিকীকরণ বলতে তাই বোঝাতো। এখন বিশ্বায়ন বলতে জাতীয় অর্থনীতির আন্তর্জাতিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সীমারেখা পার হয়ে উৎপাদনের একত্রীভবন ও বহুজাতিক সংস্থাসমূহ দ্বারা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিকে বোঝায়। গত একশ' বছর ধরে উৎপাদন জাতীয় সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তা আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হয়েছে, যেখানে একডজন বা তার বেশি জাতিরাষ্ট্র থেকে বহুসংখ্যক সরবরাহকারী কোম্পানি আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের সমাবেশ করে উৎপাদন চালায়। সরবরাহকারী সংস্থাসমূহের জটিল ও ব্যাপক নেটওয়ার্ক হল বিশ্বায়নের অন্যতম দিক। বিশ্বায়ন শুধু উৎপাদন ও যোগানের সম্পর্কের পরিবর্তন নয়, বিশ্বায়ন সরকারি ও বেসরকারি পরিষেবার বণ্টন ও বিক্রয়কেও প্রভাবিত করে—যেগুলি স্থানীয় বাজারের প্রয়োজন পূর্ণ করে, সেগুলিকেও। স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় অনেক পণ্যদ্রব্যই প্রধানত বহুজাতিক সংস্থাগুলি থেকে আসে। বিশ্বায়ন হল মূলধনের ব্যাপক ও নজিরবিহীন চলাচল বা প্রবাহ। এই প্রবাহ আবার কিছু নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির সঙ্গে এবং স্বাধীন বাজার মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত।

বিশ্বায়নের প্রচণ্ড রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। বিশ্বায়ন বেকারত্বের সমস্যা, মজুরী ও আয়সংক্রান্ত অসাম্য ইত্যাদি সৃষ্টি করে এবং শুধুমাত্র জাতীয় ভিত্তির ওপর অর্থনৈতিক নীতি ও কর্পোরেট আচরণের মোকাবিলাকে অসম্ভব করে তোলে। বিশ্বায়ন উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণও অনেকটা হ্রাস করে। গত কয়েক বছরে শিল্পপ্রধান দেশগুলির সাধারণ আয়যুক্ত লোকদের তুলনায় উচ্চ আয়যুক্ত ব্যক্তিদের প্রচুর উন্নতি হয়েছে আর অনেক বেশি সংখ্যক পরিবার নিরাপত্তাহীন স্বল্প বেতনযুক্ত পেশার ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে।

বিশ্বায়নের সামনে চ্যালেঞ্জ হল সমাজকাঠামোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং পরিবর্তনকে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি জনগণের ইচ্ছাধীন হয়, মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষিত হয় এবং যতবেশি সম্ভব তত বেশি সংখ্যক লোকের সমৃদ্ধি ঘটতে পারে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাজ হল আন্তর্জাতিক স্তরে নীতিকে প্রভাবিত করা, সরকার এবং বিভিন্ন উদ্যোগকর্তাদের বিশ্বায়ন দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাসমূহের জন্য দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং বাস্তব ও কার্যকর ঐক্য স্থাপন করা।

বিশ্বায়নের নিজস্ব প্রকৃতি এবং দেশের মধ্যে শক্তিশালী প্রশাসন ব্যবস্থার অস্তিত্বের জন্য উন্নত দেশসমূহ (পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশসমূহ) অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা অনেক পরিমাণে উপকৃত হয়েছে। অন্যদিকে উন্নয়নহীল দেশগুলির অনেক কম সুবিধা হয়েছে, কারণ আন্তর্জাতিক বাজার এলাকায় তাদের অসুবিধাজনক অবস্থান এবং দুর্বল জনপ্রশাসন ব্যবস্থা। বিশ্বায়নের প্রকৃতি এবং আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থার অবস্থান হল জনপ্রশাসনের আওতার বাইরে।

বিশ্বায়ন প্রধানত ধনতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতি দ্বারা সৃষ্ট, জনপ্রশাসন, রাজনীতি বা গণতন্ত্র দ্বারা নয়। যখন জাতীয় ধনতন্ত্র আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রে উন্নীত হয়, তখন ধনতন্ত্র ও বাজারের নীতিসমূহ গণতান্ত্রিক নীতিসমূহের ওপর আধিপত্য করতে থাকে। ধনতন্ত্রের সমৃদ্ধির জন্য সুস্থির পরিবেশ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রয়োজন। বাজারের ব্যর্থতার ওপর উপযুক্ত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাজার চলতে পারে না। বাজারের ব্যর্থতা ঘটলে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির দক্ষ ক্রিয়াকলাপ বাধাপ্রাপ্ত হয়। আন্তর্জাতিক বাজার এলাকায় অন্যায্য বাণিজ্য, অসমীচীন মূল্য, অসাধু নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক প্রবাহের সুনিপুণ ব্যবহার দেখা যায়। কিছু কিছু এশীয় দেশ (সাউথ কোরিয়া থেকে তাইওয়ান) ১৯৯০-এর দশকে আর্থিক ব্যাপারে বৃহৎ আন্তর্জাতিক এজেন্টদের কাছ থেকে অনিয়ন্ত্রিত আর্থিক ও নগদ প্রবাহের জন্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ কর্মচারিরা কর্মচ্যুত হয়েছিল এবং সামাজিক স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সমাধানে দেশগুলি কার্যকর কিছু করে উঠতে পারেনি, কারণ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ জনপ্রশাসনের আওতার বাইরে অবস্থান করে। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পরস্পর-নির্ভরশীলতার প্রয়োজন। জাতীয় সীমারেখার মধ্যে সাম্প্রতিককালের অনেক বিষয়, যেমন পরিবেশ সংরক্ষণ, নদীর জলের ব্যবহার, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা ইত্যাদির সমাধান করা যায় না। এগুলি সার্বজনীন এবং সমগ্র বিশ্বে এক ধরনের সাধারণ উৎস থেকে এদের উদ্ভব ঘটে।

সুদৃঢ় ও শক্তিশালী জনপ্রশাসন ব্যবস্থা বিশ্বায়ন থেকে যেকোন দেশকে অন্যান্য দেশসমূহ থেকে অনেক বেশি সুবিধা পেতে সাহায্য করে; আর বহুত্ববাদী সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা জনপ্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকাকে সাধারণত খর্ব করে থাকে। পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অনেক দেশ বাজেট, কর্মীবিভাগ ও সমগ্র সংগঠন সমেত বহু এলাকাকে বেসরকারিকরণ, আউটসোর্সিং, বিনিয়ন্ত্রণ, সরকারি পরিষেবা ও কাজের পুনর্গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে আরো কার্যকর করেছে। তারা অনেক বেশি দক্ষতা, কার্যকারিতা, উৎপাদনশীলতা, সংবেদনশীলতা ও স্বচ্ছতা অর্জন করেছে। এই বিষয়গুলি ওই সব দেশগুলিকে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক লেনদেন ও বাণিজ্য ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। ফলে বহুজাতিক বা অতিজাতিক কর্পোরেশন বা বিশ্বব্যাপী পরিব্যপ্ত বেসরকারি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে তারা অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় আছে।

দুর্বল প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশ্বায়ন থেকে অন্যদের তুলনায় অনেক কম সুবিধা ভোগ করে থাকে কিনা তার হল বিতর্কের বিষয়; তবে কারণ ওই সব দেশের জনপ্রশাসন, শাসনব্যবস্থা ও প্রশাসন নির্ধারিত ও প্রভাবিত হয় দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক কাঠামো ও আচরণ, অনুন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সস্তার ত্রুটিপূর্ণ প্রযুক্তি, দুর্বল পরিকাঠামো এবং কম শিক্ষা দ্বারা। দরিদ্র দেশগুলি তাদের সম্পদের স্বল্পতা, দক্ষ কর্মীবৃন্দের অভাব, প্রযুক্তিগত দুর্বলতা, তথ্যের স্বল্পতা ইত্যাদির জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

তাছাড়াও দরিদ্র দেশগুলি সাধারণভাবে সম্পদশালী দেশগুলির প্রভাবাধীন। আর সম্পদশালী দেশগুলি তাদের জাতীয় ও কর্পোরেট স্বার্থ পূরণের জন্য অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগতভাবে পশ্চাৎপদ দেশগুলিকে শোষণ করে থাকে।

উন্নত ও অনুন্নত সব দেশই জনপ্রশাসন ও সরকারি আমলাতন্ত্রকে দক্ষ ও কার্যকর করার জন্য বেসরকারিকরণ, সরকারি কাজের বিনিয়ন্ত্রণ ও সংকোচন, তথ্যপ্রযুক্তির সংহতিকরণ ইত্যাদির প্রচেষ্টা করছে।

৩.৯ জনপ্রশাসনে পরিবর্তন

বিশ্বায়ন, বেসরকারিকরণ ও উদারীকরণ বর্তমানে ক্রমবর্ধিত হারে রাষ্ট্রের চরিত্র ও জনপ্রশাসনের প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। সেই সব পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ ও উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ হল জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে কঠিনতম চ্যালেঞ্জ। পণ্ডিত ও পেশাদারী ব্যক্তিরা এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত কয়েকটি কৌশলের কথা বলেন—

(১) পাবলিক সার্ভিস সংস্কার : পাবলিক সার্ভিস সংস্কারের অন্যতম একটি কারণ হল ১৯৮০ সালে ইংলন্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে এবং ১৯৯০ সালে ভারতে অবাধ বাণিজ্য অর্থনীতির প্রবর্তন। নব অর্থনৈতিক নীতি, কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি, বিনিয়ন্ত্রণ, বেসরকারিকরণ ইত্যাদি হল পাবলিক সার্ভিস সংস্কারের বিভিন্ন নাম। সরকার এবং সরকারি বাণিজ্যের বাজার সংস্কার নীতির ফলগুলিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে নানা নামে অভিহিত করা হয়—নতুন ধরনের শাসনব্যবস্থা, বাজার পরিচালিত সরকার, নব সরকারি পরিচালনা, ক্ষমতা বিভাজন, রাষ্ট্রকে হালকাতর করা, রাষ্ট্রের ক্ষমতার সংকোচন ইত্যাদি। সরকারের ধারণা, সরকারের গঠন, শাসনের পদ্ধতির ওপর অবাধ বাণিজ্য অর্থনীতির এইসব প্রভাব হল বর্তমানে বিশ্বব্যাপী আলোচনা ও বিতর্কের সাম্প্রতিক ধারা ও এজেন্ডা।

(২) সরকারের পুনঃসৃজন : জনপ্রশাসনের পুনঃসৃজন বা পুনর্নির্মাণ দ্বারা বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার উপযোগী করার ক্ষেত্রে নব জনপ্রশাসন বা নতুন সরকারি পরিচালনার ধারণাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবযুক্ত। উন্নত বা অনুন্নত দেশগুলির নীতিসমূহ ক্রমাগত নব জনপ্রশাসন ও সরকারের পুনঃসৃজন বা পুনর্নির্মাণ ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। সেই ব্যবস্থাগুলি হল বেসরকারিকরণ, বিনিয়ন্ত্রণ, বাজার প্রক্রিয়া, বিকেন্দ্রীকরণ ও বেআমলাতান্ত্রিকীকরণ। এখন বলা হয় যে সরকারি ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবসাসংক্রান্ত নীতিসমূহকে প্রবর্তন করতে এবং কার্যকরভাবে যেগুলি মেনে চলতে হবে। নতুন বা নব জনপ্রশাসন ও সরকারের পুনর্নির্মাণ নীতির বিধান অনুসারে সরকার শুধু যে ব্যবসা সংক্রান্ত প্রশাসনের কৌশলগুলি গ্রহণ করবে, তাই নয়, ব্যবসায়িক কারবারের মূল্যবোধকেও অর্জন করবে—হস্তচালিত নৌকাচালনার বদলে যন্ত্রচালিত নৌকাচালনার শক্তি অর্জন করবে এবং পরিষেবার বদলে ক্ষমতায়নের নীতি গ্রহণ করবে; আর উপভোক্তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করা, বাজারের মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটানো, পণ্যবণ্টন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করবে। নব জনপ্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হল পরিচালনা, কাজের মূল্যায়ন ও দক্ষতা। নব জনপ্রশাসন সরকারি আমলাতন্ত্রকে কয়েকটি এজেন্সিতে রূপান্তরিত করে, যারা প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদান নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়, বাজারের ওপর নির্ভর করে এবং প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করে। এই পরিচালনার ধরন হল সামগ্রিকভাবে খরচ কমানো, সরকারি ব্যয়ের সংকোচন এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিকভাবে অনুপ্রেরণা প্রদান।

(৩) উদ্যোক্তা হিসাবে সরকার : সরকারি অফিস বলতে সাধারণত ধূলিমলিন, নোংরা, কাগজপত্র-ভরা জায়গাকে বোঝায়, যেখানে বাবুরা সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেন। ক্রমস্তরবিন্যস্ত কাঠামো, জটিল পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের পরীক্ষা নিরীক্ষার দীর্ঘসূত্রী ব্যবস্থা ইত্যাদি ছিল এর বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষ সরকারি কর্মচারীদের শোষক হিসাবে দেখতেন, সহায়ক বন্ধু হিসাবে নয়। এখন প্রশাসনিক অস্থিরতা ও সমস্যাসমূহ মোকাবিলার উপায় হল উদ্যোক্তা হিসাবে সরকারের ভূমিকা। সাম্প্রতিককালে বিশ্বায়নের চাপের ফলে উদ্যোক্তা হিসাবে সরকারের দুটি বৈশিষ্ট্য—দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সরকারি ক্ষেত্রের সংস্থাসমূহ এখন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতার উন্নতির জন্য বিশ্বব্যাপী চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। তাই সরকারি আমলাতন্ত্র বর্তমানে অপচয় কমানো, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো এবং দ্রব্য ও পরিষেবার উন্নততর বন্টন ব্যবস্থার চেষ্টা করছে।

(৪) আমলাতন্ত্রের পরিবর্তনশীল ভূমিকা : মূল ধারণাগত ব্যাখ্যা হিসাবে অর্থনৈতিক উদারীকরণ প্রক্রিয়া অর্থনীতিতে সরকারি হস্তক্ষেপের সংকোচনের কথা বলে। ফলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারি আমলাতন্ত্রের ভূমিকার অবনয়ন ঘটে। তবে এটা জানা প্রয়োজন যে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণের ফলে আমলাতন্ত্র অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে—সে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ার সহায়ক, গতিবৃদ্ধিকারী ও মান-বৃদ্ধিকারীর ভূমিকা পালন করে।

(৫) শাসন প্রক্রিয়া : শাসন-প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় সরকারের নীতি পরিকল্পনা, নীতি প্রণয়ন ও নীতি প্রয়োগের সামর্থ্যকে। সুশাসনের অর্থ হল দক্ষ জনপ্রশাসন, যা হল কার্যকর ও জনমুখী প্রশাসনিক কৌশল দ্বারা রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে ব্রীজ নির্মাণ প্রক্রিয়া। সুশাসনের ধারণাটি ১৯৮৯ সাল থেকে দেখা দেয় এবং সাব-সাহরান আফ্রিকা সংক্রান্ত বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয়। এই প্রতিবেদন অনুসারে সুশাসন হল দক্ষ শাসন ব্যবস্থা, নির্ভরযোগ্য বিচারব্যবস্থা এবং জনগণের কাছে দায়িত্বশীল প্রশাসন। সুশাসন হল উদ্দেশ্যমূলক, উন্নয়নমুখী এবং জনগণের জীবনের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এর জন্য প্রয়োজন হল উচ্চস্তরের সংগঠনগত দক্ষতা ও কার্যকারিতা এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্তি। সুশাসন হল নাগরিকদের প্রতি যত্নবান, নাগরিক-সহায়ক এবং নাগরিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল প্রশাসন ব্যবস্থার প্রয়োগ।

(৬) ই-শাসন : ই-শাসন হল সরকারি কাজে তথ্য ও প্রযুক্তির প্রয়োগ, যা সরল, নীতিভিত্তিক, দায়িত্বশীল, সহানুভূতিমূলক ও স্বচ্ছ সরকার সুনিশ্চিত করে। ই-শাসনের গতি ও স্বচ্ছতার জন্য জনপ্রশাসন জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দক্ষ গণভিত্তিক প্রশাসনে পরিণত হয়।

(৭) রাষ্ট্রের পুনরাগমন : বিশ্বায়ন বলতে বোঝায় সার্বজনীনভাবে উদারীকরণের প্রসারকে আর উদারীকরণ হল প্রধানত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করার প্রক্রিয়া—অর্থনীতিকে বাজারের শক্তিসমূহ দ্বারা পরিচালিত করা, রাষ্ট্রের দ্বারা রচিত নিয়ম ও আইনের ভিত্তিতে নয়। বিশ্বায়নের ফলে রাষ্ট্র অর্থনীতির বিভিন্ন এলাকা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত বা প্রত্যাহার করে বা সরিয়ে নেয় বা পশ্চাদপসরণ করে। একটি উদারীকৃত রাষ্ট্র যেসব মূল এলাকাগুলির প্রতি মনঃসংযোগ করে, সেগুলি হল প্রতিরক্ষা বা স্বরাষ্ট্র বা বৈদেশিক দপ্তর ইত্যাদি। বাকি সব এলাকাগুলিকে (আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক) রাষ্ট্র বেসরকারি ক্ষেত্রের হাতে ছেড়ে দেয়। যখনই রাষ্ট্র এগুলি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়, তখন উন্নত দেশগুলিতে বেসরকারি উদ্যোগ বা অরাষ্ট্রীয় কারক, যেমন স্বেচ্ছামূলক

সংস্থাসমূহ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠন ইত্যাদি রাষ্ট্রের শূন্যস্থান পূর্ণ করে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে রাষ্ট্র বনাম বাজার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে এমনভাবে পরিবর্তিত করা যাতে বুর্জোয়া-সামন্ততান্ত্রিক- আমলাতন্ত্রের সংযোগ থেকে জনগণের জন্য প্রকৃত গণতন্ত্রে পৌঁছানো যায়। উন্নত বাজারভিত্তিক রাষ্ট্রগুলিতে বাজার অর্থনীতির প্রবর্তন স্বাভাবিকভাবে ধনতান্ত্রিক পথে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে সম্পূর্ণ আলাদা উন্নয়ন মডেলের প্রয়োজন—এমন একটি মডেল বা জনগণের সাধারণ কল্যাণ সুনিশ্চিত করে, যা ধনতান্ত্রিক শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত। বিশ্বব্যাঙ্ক স্পন্সরকৃত "রাষ্ট্রের পুনর্বিবেচনা" ("Rethinking the state") মডেল এখন জনপ্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের যৎসামান্য ভূমিকা এবং অবাধ বাণিজ্য নীতি তৃতীয় বিশ্বের পক্ষে বিপজ্জনক; সেখানে সরকারের কাজ হল সামাজিক প্রচেষ্টাসমূহকে সমন্বিত করে দারিদ্র্য, অপুষ্টি, রুগ্ন স্বাস্থ্য এবং সামন্ততান্ত্রিক- ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবিচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং সমাধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ফলে তৃতীয় বিশ্বের বাস্তব প্রয়োজন হল সম্প্রসারিত এজেন্ডা বা কর্মসূচিসহ শক্তিশালী রাষ্ট্র। রাষ্ট্র তার নিয়ন্ত্রণমূলক কাজগুলি থেকেও বঞ্চিত হবে না। রাষ্ট্র অর্থনীতির অপ্রয়োজনীয় এলাকাগুলি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করতে পারে, কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের লক্ষণীয় উপস্থিতি থাকবে।

(৮) নাগরিকদের ক্ষমতায়ন : বিশ্বায়নের ফলে তৃণমূল স্তরের নাগরিকদের উত্থান ঘটেছে—নারীদের ক্ষমতায়ন, সকলের জন্য শিক্ষা, মানবিক অধিকার, উপভোক্তা অধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ, বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। জনপ্রশাসনকে ঘিরে সাম্প্রতিককালের সংস্কার প্রচেষ্টাগুলির অন্যতম অংশ হল নাগরিকদের ক্ষমতায়ন।

৩.১০ উপসংহার

গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে বিশ্বায়ন প্রচেষ্টার আধিপত্য দেখা যাচ্ছে। এই প্রবণতা বাজার-অর্থনীতির ওপর নির্ভরতা, ব্যক্তিগত মূলধন ও সম্পদের ওপর বিশ্বাস এবং কাঠামোগত সমন্বয় প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা বৃদ্ধি করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশ্বায়ন নতুন ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। উন্নত দেশগুলির বাজারের উন্মুক্তকরণ এবং প্রযুক্তির হস্তান্তরকরণ তাদেরকে উন্নততর জীবনযাত্রা ও উন্নততর উৎপাদনশীলতা সুনিশ্চিত করেছে। তবে বিশ্বায়ন কিছু নতুন চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করেছে, যেমন একদিকে দেশের মধ্যে এবং অন্যদিকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি, আর্থিক বাজারের অনিশ্চয়তা, পরিবেশ দূষণের সমস্যা ইত্যাদি। বিশ্বায়নের আর একটি অসুবিধা হল যে অনেক উন্নয়নশীল দেশই এই প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে গেছে। তবে জাতীয় অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের তাৎপর্য খুব বেশি। এর ফলে বিশ্ববাজারের বিভিন্ন জাতীয় অর্থনীতির মধ্যে একদিকে প্রতিযোগিতা এবং অন্যদিকে পরস্পর-নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পণ্য ও পরিষেবা সংক্রান্ত বাণিজ্য এবং মূলধনের গতিবিধির মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর শুধুমাত্র দেশীয় বা জাতীয় নীতি ও বাজার দ্বারা নির্ধারিত হয় না; এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা উভয়ের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ যে কোন বিশ্বায়িত অর্থনীতি তার নিজের আভ্যন্তরীণ নীতি স্থির করার সময় বিশ্বের অন্যান্য অংশের নীতিসমূহের সম্ভাব্য ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করতে পারে না। ফলে জাতীয় স্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নীতিগত স্বাতন্ত্র্য হ্রাস পাচ্ছে।

বিশ্ব এখন অনেকাংশে জাতীয় সীমানাবিহীন হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমহ্রাসমান। আবার ব্যক্তিগত উদ্যোগমূলক সংস্থাগুলির ভূমিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শক্তিশালী নানা প্রযুক্তি, যেমন কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল, টেলিকম ইত্যাদি রাষ্ট্রের অনুমোদন ছাড়াই রাষ্ট্র ও ব্যক্তিসমূহের নিজেদের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগ সম্ভব করেছে। বর্তমানে দ্রুতগতিতে আন্তঃসীমান্ত একীকরণ দেখা যাচ্ছে, বিশেষত অর্থনৈতিক ও ব্যবসা ক্ষেত্রে। তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নতি সমগ্র বিশ্বকে পরস্পর-সংযুক্ত করেছে এবং পণ্য ও পরিষেবার বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতের উদ্ভব ঘটিয়েছে। বিশ্বায়ন স্থানীয় পরিচয় ও স্থানীয় যোগাযোগকে দুর্বল করে বিশ্ব সমাজ ও বিশ্ব সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটিয়েছে। জনপ্রশাসন, এখন নাগরিক অধিকার, নৈতিক মূল্যবোধ, দায়িত্ব, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিকে গুরুত্ব প্রদান করছে এবং প্রশাসনিক বিশ্লেষণের কাঠামো হিসাবে সুশাসন, ই-শাসন ও কর্পোরেট শাসনকে গুরুত্ব দিচ্ছে। রাষ্ট্রের ভূমিকা, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ইত্যাদি এখন কমে যাচ্ছে, আর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বিকেন্দ্রিকতা, স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি বিষয়সমূহকে। বিশ্বায়ন থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার জন্য প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্গঠনের সমস্যাগুলির প্রতি জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞদের নজর দিতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বাধ্য করছে।

৩.১১ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) বিশ্বায়নের ফলে সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত দিকে যেসব পরিবর্তন ঘটছে, সেগুলি পর্যালোচনা করুন।

(২) বিশ্বায়নের ইতিহাস আলোচনা করুন।

(৩) ইউরোপ ও আমেরিকা এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশে বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা করুন।

(৪) বিশ্বায়নের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বিশ্লেষণ করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) বিশ্বায়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

(২) বিশ্বায়ন ও জনপ্রশাসনের পারস্পরিক সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করুন।

(৩) বিশ্বায়নের সমস্যাসমূহের মোকাবিলা করার জন্য জনপ্রশাসন দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন কৌশলগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝানো হয়?

(২) বিশ্বায়নের ফলে অর্থনৈতিক দিকে কী পরিবর্তন ঘটে?

(৩) বিশ্বায়নের রাজনৈতিক প্রভাব কী?

(৪) বিশ্বায়নের ফলে কী সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে?

(৫) বিশ্বায়নের প্রযুক্তিগত প্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করুন।

(৬) বিভিন্ন অবাধ বাণিজ্য অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করুন।

(৭) বিশ্বায়ন বিরোধিতা বলতে কী বোঝানো হয়?

৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

Aseem Prakash and Jeffery A. Hart (ed.)—*Globalisation and Governance*, Routledge, London, 1999.

Box, Richard (et.al.)—"New Poulic Management and Substantive Democracy", *Public Administration Review*, (61) (5) pp 606-619.

Kette, D. F.—"The Transformation of Governance, Devolution and the Role of Government", *Public Administration Review* 60 (6) pp 488-497.

একক-৪ ❑ উদারিকরণের যুগে ভারতীয় প্রশাসন

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ উদারনীতিবাদ একটি পরিবর্তনশীল দর্শন

৪.৪ ভারতীয় অর্থনীতি—সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন—প্রথম পর্যায়

৪.৫ ভারতীয় অর্থনীতি—উদারনীতিবাদী বা উদারিকরণ প্রবণতা—দ্বিতীয় অধ্যায়

৪.৬ উদারনীতিকরণের নতুন অর্থনৈতিক নীতি এবং এই সংক্রান্ত কিছু আইন

৪.৭ ভারতীয় অর্থনীতিতে উদারিকরণের প্রভাব

৪.৮ উদারিকরণের অসুবিধাসমূহ

৪.৯ উদারিকরণের সুবিধাসমূহ

৪.১০ উপসংহার

৪.১১ নমুনা প্রশ্নাবলী

৪.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি আপনাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত করবে এবং আপনি সেগুলিকে আপনার গবেষণা বা উচ্চতর একাডেমিক কাজে ব্যবহার করতে পারবেন :

- উদারনীতিবাদের ধারণা এবং উদারনীতিবাদের পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিত।
- স্বাধীন ভারতে সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের প্রবর্তন এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় অর্থনীতিকে ব্যালান্স অফ পেমেন্ট সংকট থেকে মুক্ত করার জন্য উদারীকরণের পথে ভারত সরকারের যাত্রা (প্রথমে ১৯৬৬ এবং পরে ১৮৮৫ সালে), অবশ্য মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমসহ।
- ভারত সরকার দ্বারা গৃহীত নতুন অর্থনৈতিক নীতি (১৯৯১)-এর উদ্দেশ্যসমূহ এবং সেজন্য কিছু আইন গ্রহণ।
- ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে উদারীকরণ নীতির কিছু সুবিধা ও অসুবিধা।

৪.২ ভূমিকা

উদারিকরণ হল বিশ্বায়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একটি প্রক্রিয়া, যা আবার বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ার সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিশ্বায়ন, উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণ—এই তিনটি পরস্পর সংযুক্ত প্রক্রিয়া আধুনিক জীবনের সব স্তরকে স্পর্শ এবং প্রভাবিত করে। বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি, রাজনীতি, সরকার, প্রযুক্তি, সাংস্কৃতিক বিষয় এবং সামাজিক দিকসমূহ এই প্রক্রিয়াত্রয়ের আওতাধীন। এই তিনটি প্রক্রিয়া সব ধরনের সরকারের নীতি ও কর্মসূচির ক্ষেত্রে পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। ভারতের ক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। উদারিকরণের যুগে ভারতীয় প্রশাসনের আলোচনা শুরু করার আগে এই তিনটি প্রক্রিয়ার অর্থ পরিষ্কারভাবে জানা প্রয়োজন।

বিশ্বায়ন হল বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্কসমূহের তীব্র প্রকাশ, যা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহকে এমনভাবে সংযুক্ত করে যাতে বহু মাইল দূরে সংগঠিত ঘটনাসমূহ দ্বারা স্থানীয় এলাকার যাবতীয় ঘটনাবলি প্রভাবিত হয়। অতীতে ঘটা যাবতীয় আদান-প্রদানের থেকে অনেক বেশি ব্যাপকভাবে এবং ব্যাপকতর স্তরে আদানপ্রদান ঘটে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। বিশ্বায়ন শব্দটি আন্তর্জাতিক শব্দটি থেকে স্বতন্ত্র একটি ধারণা প্রকাশ করে। বিশ্বায়ন জাতীয় সীমানার গুরুত্ব হ্রাস করে। বিশ্বায়নের জন্যই মানুষ, পণ্যদ্রব্য, পরিষেবা, অর্থ, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, ধারণাসমূহ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান এমনকি মহামারী, সন্ত্রাসবাদ ও পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি অবাধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে।

উদারিকরণ, যা সাধারণভাবে অবাধ বাণিজ্য হিসাবে অর্থনীতির জগতে পরিচিত তার অর্থ হল বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমস্ত রকম বাণিজ্যসংক্রান্ত বাধা ও নিয়ন্ত্রণের অপসারণ। রাজনৈতিক জগতে উদারিকরণ বলতে বোঝায় পৌর স্বাধীনতা, সীমাবদ্ধ সরকার এবং গণতান্ত্রিক ও সাম্যভিত্তিক সমাজের অস্তিত্বকে। এই উদারিকৃত সমাজের সমস্ত ব্যক্তি তাদের গুণগত ক্ষমতাসমূহকে বাস্তবায়িত করার সম সুযোগ ভোগ করে এবং সেখানে লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

বেসরকারিকরণ হল আজকের সমাজের বৈশিষ্ট্য, যার বক্তব্য হল সরকারি ক্ষেত্রের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণকে বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তির কাছে হস্তান্তরকরণ।

৪.৩ উদারনীতিবাদ একটি পরিবর্তনশীল দর্শন

বিশ্বায়ন, উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণ—তিনটি প্রক্রিয়াই উদারনীতিবাদী দর্শনের সঙ্গে সংযুক্ত, যা প্রধানত ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিগত অধিকারের দর্শন হিসাবে পরিচিত এবং বিশেষভাবে রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থানযুক্ত। তবে উদারনীতিবাদী দর্শন বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পণ্ডিতদের দ্বারা বিভিন্ন রূপে এবং বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের উদ্ভব ঘটে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে। ষোড়শ শতকে বিশ্ব সম্বন্ধে উদারনীতিবাদী ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় পরিবেশ ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রবণতা দেখা যায়। সপ্তদশ শতকে উদারনীতিবাদ একটি রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক তত্ত্ব হিসাবে লক দ্বারা বিকশিত হয়। লককে তাই উদারনীতিবাদের

প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৬৮৮ সালের ইংলন্ডের গৌরবময় বিপ্লব উদারনীতিবাদের ভিত্তি স্থাপন করে। এই সময় রাজার ক্ষমতার সীমাবদ্ধকরণ, রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার ঘোষণা, অধিকারের বিল প্রণয়ন এবং শাসিতদের সম্মতির ভিত্তিতে সরকার গঠন নীতি স্বীকৃত হয়। ১৭৭৭ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা (Declaration of Independence) দ্বারা আমেরিকা একটি প্রজাতন্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকার সরকার বংশানুক্রমিক কোন রাজপদ বা অভিজাততন্ত্রকে স্বীকৃতি দেয়নি, বরং সমস্ত মানুষের সাম্যনীতিকে গুরুত্ব দেয়। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রকে হঠিয়ে দিয়ে 'স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বে'র শ্লোগানের জন্ম দেয় এবং পুরুষদের জন্য সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ফ্রান্সের সংবিধানের মানুষ ও নাগরিকদের অধিকারের ঘোষণা পরবর্তীকালে অনেক শক্তিশালী বৈপ্লবিক আন্দোলনকে প্রেরণা দান করে আর বিভিন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অভিজাততান্ত্রিক প্রাচীন শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতাচ্যুত হয়। এইভাবে উদারনীতিবাদ বৈপ্লবিক রাজনৈতিক তত্ত্বের মর্যাদা লাভ করে।

ধ্রুপদী বা সাবেকি উদারনীতিবাদ বাক্ স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, অবাধ বাণিজ্য ও অবাধ বাজার নীতি, সীমাবদ্ধ সরকার, ব্যক্তির জীবনে সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ইত্যাদির ওপর জোর দেয়। এই সাবেকি উদারনীতিবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও নেতিবাচক রাষ্ট্রের ধারণার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের বদলে দেখা দেয় সামাজিক উদারনীতিবাদ, যাকে উদারনীতিবাদের নব আকারে প্রকাশ বলা যায়। এই নতুন উদারনীতিবাদ রাষ্ট্র সম্বন্ধে নেতিবাচক ধারণার বদলে ইতিবাচক ধারণার জন্ম দেয়, কারণ ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে এই সময় ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখা যায়, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। ফলে রাষ্ট্র দ্বারা সুনিশ্চিত অনুকূল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন চাহিদার সৃষ্টি হয়। তাই রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-নির্দেশিত সংস্কারমূলক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। তখন বোঝা যায় যে বাজার অর্থনীতির ওপর নির্ভরতা অধিকাংশ জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত ন্যূনতম প্রয়োজনকে উপেক্ষার কারণ হতে পারে। ফলে সব কিছুই সরকারি নীতি দ্বারা নির্দেশিত হতে থাকে। এই সময়ের উদারনীতিবাদের অন্যতম প্রবক্তা গ্রীণ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণার ওপর জোর দেন, যে রাষ্ট্র জনগণের স্বার্থে তার কাজের পরিধি বিস্তৃত করে—যে রাষ্ট্র সাবেকি উদারনীতিবাদের প্রবক্তাদের দ্বারা ঘোষিত নেতিবাচক রাষ্ট্র নয়। কিন্স বলেন যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ণ দায়িত্বগ্রহণ করবে।

উভয় ধরনের উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়—সাবেকি উদারনীতিবাদ সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আর নতুন সামাজিক উদারনীতিবাদ ধনতন্ত্রের ত্রুটিগুলির বিরুদ্ধে। উভয়েই ব্যক্তির উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু প্রথমটি নেতিবাচক আর দ্বিতীয়টি ইতিবাচক রাষ্ট্রের ধারণার জন্ম দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অবস্থার আবার পরিবর্তন ঘটে, কারণ দেখা যায় যে সরকার জনগণের আশাআকাঙ্খা রূপায়নে ব্যর্থ হয়েছে; সরকারের আর্থিক স্বল্পতাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বিকশিত হয় নয়া উদারনীতিবাদ, যাকে প্রধানত ধ্রুপদী বা সাবেকি উদারনীতিবাদের পুনরুত্থান বলা যায়। নয়া

উদারনীতিবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াকলাপ, মুক্ত অর্থনীতি, অবাধ বাণিজ্য ইত্যাদির ওপর জোর দেয়। এফ. এ. হায়েক, জন রলস্, রবার্ট নজিক ইত্যাদিরা হলেন নয়া উদারনীতিবাদের কয়েকজন প্রবক্তা।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে উদারনীতিবাদের বিবর্তন ঘটেছে তিনটি স্তরের মাধ্যমে—

(i) ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ (ষোড়শ ও সপ্তদশ থেকে)

(ii) সামাজিক বা নতুন বা নব উদারনীতিবাদ (ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে)

(iii) নয়া উদারনীতিবাদ বা ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের পুনরুত্থান (১৯৬০—৭০ সাল থেকে)

১৯৪৭ সালে ভারত ব্রিটিশ শাসন মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকার সামাজিক উদারনীতিবাদ নীতি গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্র-নির্দেশিত সমাজকল্যাণমূলক নীতিসমূহের মাধ্যমে উন্নয়ন ও বিকাশের পথে তার যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ১৯৯১ সালে ভারত সরকার নয়া উদারনীতিবাদের দিকে ঝোঁকে এবং মুক্ত অর্থনীতি, রাষ্ট্র দ্বারা সমাজের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, অবাধ বাণিজ্য ইত্যাদি সমর্থন করে এবং বিশ্বায়ন ও বেসরকারিকরণের পথ পছন্দ করে।

৪.৪ ভারতীয় অর্থনীতি—সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন—প্রথম পর্যায়

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত নীতিসমূহ একদিকে ভারতের ঔপনিবেশিক অতীত, যা প্রধানত শোষণমূলক প্রকৃতিযুক্ত ছিল এবং অন্যদিকে কিছু ভারতীয় নেতাদের দ্বারা স্বীকৃত তৎকালীন দেশীয় সমাজবাদের ব্যাখ্যা অনুসারে প্রভাবিত হয়েছিল। ভারতীয় রাষ্ট্রকে উন্নয়নের পথে স্থাপন করার জন্য সেই সময়ের ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণাকে গ্রহণ করেন। তাঁরা দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্য এবং বণ্টনমূলক ন্যায়ের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তাঁদের মনে হয় যে শুধুমাত্র আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষণাবেক্ষণই যথেষ্ট নয়; তাই তখনকার সরকারি নীতির ঝোঁক ছিল সংরক্ষণবাদ, আমদানির বিকল্পের সন্ধান, রাষ্ট্র নির্দেশিত শিল্পায়ন, সমস্ত ব্যবসায়, বিশেষত শ্রম ও অর্থনৈতিক বাজারের সমষ্টিগত স্তরে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, একটি বৃহৎ সরকারি ক্ষেত্র ও তার পাশাপাশি একটি দুর্বল বেসরকারি ক্ষেত্র, ব্যবসাক্ষেত্রে নানা নিয়ন্ত্রণ এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মিল পাওয়া যায়। ইস্পাত, খনি, জল, টেলিকম, ইনসিওরেন্স বা জীবনবীমা, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, যন্ত্রপাতি নির্মাণ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পগুলি ১৯৫০ এর মাঝামাঝি কার্যকরভাবে রাষ্ট্রীয়করণের আওতাধীন হয়। জটিল লাইসেন্স প্রথা, নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি, লাল ফিতের ফাঁস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণগুলি 'লাইসেন্স রাজ' নামে পরিচিত লাভ করে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৯০—এই বিপুল সময়ের মধ্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করার জন্য লাইসেন্স রাজ্যের প্রয়োজন হত। এই সময় ভারত সরকার ভারতীয় অর্থনীতিকে বাইরের জগতের কাছে বন্ধ করে দেয়। উচ্চহারে রাজস্ব এবং আমদানির জন্য লাইসেন্স ব্যবস্থার ফলে বাইরে থেকে পণ্যদ্রব্য ভারতীয় বাজারে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ভারতীয় অর্থনৈতিক নীতিসমূহের মূল ভিত্তি ছিল আমদানি বিকল্পের খোঁজ আর সরকার দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের ওপর নির্ভরতাকে গুরুত্ব দেয়—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে নয়। মুক্ত বাজার ও অবাধ বাণিজ্য নীতির বদলে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্র-নির্দেশিত পরিকল্পনার শরণাপন্ন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কত পরিমাণ জোর প্রয়োজন হবে, কি কি উৎপাদিত হবে, কতটা উৎপাদিত হবে, তাদের মূল্য কি হবে ইত্যাদি সব কিছুই

রাষ্ট্র দ্বারা নির্ধারিত হতে থাকে। আর আমলাতন্ত্র প্রায়শই অযৌক্তিক বিধিনিষেধের বোঝা আরোপ করে—উৎপাদনসংক্রান্ত লাইসেন্স প্রদানের জন্য কোম্পানিকে অনেক ক্ষেত্রে ৮০টি সংস্থার সন্তুষ্টি বিধান করতে হয়।

উন্নয়ন ও কল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ রূপায়ন এবং বন্টনমূলক ন্যায় ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য রাষ্ট্র বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিকে হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি করতে থাকে। সিদ্ধান্ত করা হয় যে রাষ্ট্র স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং বিশাল সংখ্যক গ্রামীণ অধিবাসী ও সমাজের দুর্বলতর অংশের উন্নয়ন ও বিকাশকে গুরুত্ব প্রদান করবে।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরু সমাজতান্ত্রিক ধাঁচকে বেছে নেন এবং উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা নীতিকে উৎসাহিত করেন। ১৯৫০-এর দশকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়—একটি হল পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) এবং অন্যটি হল জাতীয় উন্নয়ন পর্ষৎ (National Development Council)। ১৯৫০ সালে ভারত সরকারের একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়, এটি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্থা নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে এর কাজগুলি হল দেশের সম্পদের পরিমাপ নির্ণয়, সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিরূপণ, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য উপকরণসমূহের নির্ধারণ, পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তরে অর্জিত অগ্রগতির ভিত্তিতে সামগ্রিক অগ্রগতির মূল্যায়ন।

১৯৫২ সালে সরকারি প্রস্তাবের ভিত্তিতে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষৎ গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি, পরিকল্পনার সফল রূপায়নের জন্য দেশের সম্পদ ও বিভিন্ন প্রচেষ্টাসমূহের সমন্বয়সাধন, গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির জন্য সাধারণ নীতি প্রণয়ন এবং দেশের সব অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের সুনিশ্চিতকরণ।

১৯৬৬ সালে ভারত সরকার একটি প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি গঠন করে। সরকারি কাজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মানের দক্ষতা ও সততার নিশ্চয়তা প্রদান, সরকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি কার্যকর করার উপযোগী সংস্থা হিসাবে জনপ্রশাসনের গঠন, উন্নয়নের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্য অর্জন এবং জনপ্রশাসনকে জনগণের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলা ইত্যাদি ছিল এই কমিটির লক্ষ্য।

১৯৬২ সালে পরিকল্পনা কমিশন রাজ্য সরকারগুলির কাছে পরিকল্পনা কমিশনের আদলে রাজ্য পরিকল্পনা কমিশন গঠনের জন্য প্রস্তাব করে। তাদের কাজ হবে রাজ্যের সম্পদ ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। ১৯৬৬ সালে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন একটি ত্রি-স্তর বিশিষ্ট ব্যবস্থার কথা বলে—রাষ্ট্রীয় এজেন্সি, ক্ষেত্রগত পরিকল্পনা এজেন্সি এবং আঞ্চলিক ও জেলা পরিকল্পনা এজেন্সি। প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির সুপারিশ মেনে পরিকল্পনা কমিশন রাজ্যগুলিকে রাজ্য পরিকল্পনা কমিশন গঠনের জন্য পুনঃ সুপারিশ করে এবং সাধারণভাবে পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে জোরদার করতে বলে। কয়েকটি রাজ্যে এই সুপারিশ মত রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড গঠিত হয়। সেইসব রাজ্য স্তরের প্রত্যেক সরকারই নিজের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা বিভাগ সেগুলিকে সমন্বিত করে এবং তাদেরকে খসড়া আকারে প্রস্তুত করে। রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ড সেগুলি অনুমোদন করার পর সেগুলি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের কাছে বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়।

জেলা ও ব্লক স্তরেও পরিকল্পনা ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েত আর শহর এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটি আছে। এইভাবে কেন্দ্র, রাজ্য ও তার নিচের স্তরে পরিকল্পনা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীভবন ঘটানো হয়েছে। তবে এই নিচের স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলি খুবই দুর্বল। তারা প্রধানত তথ্য সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে। তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না—চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারসমূহ। ভারতের সংবিধান সামাজিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণি, বিশেষত তপশিলি জাতি ও উপজাতি, মহিলা ও শিশুদের জন্য বিভিন্ন ধারা অন্তর্ভুক্ত করে। তার ফলশ্রুতি হিসাবে নীতি ও কর্মসূচিগত নেটওয়ার্ক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসমূহের উদ্ভব ঘটেছে। ১৯৬৪ সালে সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগ সংগঠিত হয় কেন্দ্রীয় স্তরে সামাজিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্য। ১৯৬৬ সালে এর নাম হয় সামাজিক কল্যাণ বিভাগ আর ১৯৭৯ সালে তা একটি মন্ত্রকে রূপান্তরিত হয়—তার নাম হয় শিক্ষা ও সামাজিক কল্যাণ মন্ত্রক। ১৯৮৫ সালে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য দায়িত্বসহ কল্যাণ মন্ত্রণালয় (Welfare Ministry) প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী ও শিশু বিভাগকে ১৯৮৬ সালে মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। রাজ্য স্তরের সমাজকল্যাণ বিভাগগুলি সমাজের দুবর্ল অংশসমূহের উন্নতির জন্য সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত কর্মসূচিসমূহ তদারকি করে। এ সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলির বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় রাজ্য স্তরের একজন মন্ত্রীর অধীনে পরিচালিত কল্যাণ বিভাগের হাতে। এই বিভাগের অধীনে জেলা ও ব্লক স্তরের অফিসও আছে।

নারী ও শিশু বিকাশ বিভাগ নারী ও শিশুদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য কাজ করে—পরিকল্পনা, নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে, আইন প্রণয়ন করে, এবং নারী ও শিশুদের উন্নতির জন্য কর্মরত সব সরকারি ও বেসরকারি সংস্থানসমূহের কাজের সমন্বয়সাধন করে। এই বিভাগই জাতীয় মহিলা কমিশন ও রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ গঠন করে এবং জাতীয় পুষ্টিবিধান নীতি গ্রহণ করে, জাতীয় ক্রেশ তহবিল গঠন করে, ইন্দিরা মহিলা যোজনা ও গ্রামীণ নারীদের উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন প্রকল্প ইত্যাদি শুরু করে।

১৯৭৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার শিশুদের জন্য সমসুযোগ সুনিশ্চিত করার জন্য শিশুদের জন্য জাতীয় নীতি রচনা করে। অনেক পিতামাতার কাছেই কন্যা শিশু একটি বোঝা হিসাবে বিবেচিত হত। কন্যাশিশু যাতে বোঝা হিসাবে বৈষম্যের শিকার না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য সরকার একটি শ্লোগান তৈরি করে—"সুখী কন্যা শিশু হল দেশের ভবিষ্যৎ।" তাছাড়াও সরকার শিশুকন্যা হত্যা নিবারণের চেষ্টা করে এবং লিঙ্গভিত্তিক যাবতীয় বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এই প্রসঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল সরকারি সহযোগিতা ও শিশু উন্নয়নের জন্য জাতীয় ইনস্টিটিউট এবং শিশুদের জন্য জাতীয় কমিশন। এছাড়াও সরকার দেবদাসী-মেয়েদের কল্যাণ প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইকো-নারীবাদী মনোভাব ও আন্দোলন এখন প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ভারতে চিপকো ও নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন হল এ জাতীয় দুটি আন্দোলন। এই সব আন্দোলনগুলি নারীদের অধিকার এবং জল, জ্বালানি, পশুখাদ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত ন্যূনতম প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সাধারণ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন সময়ে সরকার বিভিন্ন আইন রচনা করেছে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য। যেমন—জল (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৪, বায়ু (দূষণ ও প্রতিরোধ) আইন ১৯৮১, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৮৬। ১৯৮০ সালে কেন্দ্রীয় স্তরে স্বতন্ত্র পরিবেশ বিভাগ এবং ১৯৮৫ সালে সংযুক্তভাবে পরিবেশ ও অরণ্য মন্ত্রক গঠিত হয়। ভারত সরকারের পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচির মধ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, শিল্প দূষণ ও শিল্প বর্জ্য হ্রাস, ভারতবাসীদের জন্য বিকল্প শক্তি ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ভারতের প্রথম পরিকল্পনা থেকেই তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রয়োজনগুলির দিকে নজর দেওয়া হয়। সংযুক্ত গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা হল (Integrated Rural Development Plan) এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সংবিধানে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। তাদের জন্য গৃহীত সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলির মূল্যায়নের উদ্দেশ্য নিয়ে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য জাতীয় কমিশন সৃষ্টি করা হয়। ১৯৫০ সালে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য কমিশনার হিসাবে একজন বিশেষ অফিসারকে নিযুক্ত করা হয়। তাঁর কাজ হল সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মূল্যায়ন এবং তাদের কল্যাণের দিকে নজর রাখা। উপজাতীয় কল্যাণ পরিচালনার জন্য রাজ্য ও জেলা স্তরেও কিছু অফিসারদের নিযুক্ত করা হয়। পশ্চাৎপদ হিসাবে চিহ্নিত গোষ্ঠীসমূহের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য ১৯৫৩ সালে প্রথম পশ্চাৎপদ শ্রেণী কমিশন গঠিত হয়। এজাতীয় দ্বিতীয় কমিশন গঠিত হয় ১৯৭৮ সালে।

ভারত সরকারের সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচিগুলি ছিল প্রতিরোধমূলক, পুনর্বাসনমূলক ও উন্নয়নমূলক। সমাজের দুর্বলতর অংশগুলির অগ্রগতির সম্ভাবনাসমূহ যাতে বাস্তবায়িত হয়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এগুলি পরিচালিত হয়। কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠাসমূহ এই জাতীয় কর্মসূচিগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল।

জনগণকে সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য ভারতের রাজ্যগুলিতে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪.৫ ভারতীয় অর্থনীতি—উদারনীতিবাদী বা উদারিকরণ প্রবণতা—দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় অর্থনীতিতে উদারিকরণের প্রচেষ্টা দেখা গেছে ১৯৬৬ সালে, কিন্তু ১৯৬৭ সালে যখন সমাজতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন উদারিকরণ নীতি প্রত্যাহৃত হয়। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী উদারিকরণের আরো একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি হালকা সংস্কার, লাইসেন্স রাজের সংকোচন এবং টেলিকম শিল্পের উন্নয়ন ইত্যাদির সূত্রপাত করেন, কিন্তু ১৯৮৭ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং (১৯৮৯-৯০) ও চন্দ্রশেখর (১৯৯০-৯১) কোন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের দিকে যাননি।

উদারিকরণ-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়ণ নীতিসমূহকে অনুসরণ করে ১৯৯১ সালে ভারতে অনেকগুলি সংস্কার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ভারতের বিধ্বস্ত অর্থনীতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তখন সংস্কারমূলক অবস্থার প্রয়োজন ছিল। ভারত সরকারের সমাজকল্যাণমূলক নীতিগুলি ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহায়ক ছিল না। ১৯৫০-৮০ সালের মধ্যে ভারতের বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৫%, যদিও একই সময়ে পাকিস্থানে তা ছিল ৫%, ইন্দোনেশিয়ায় ৯%, থাইল্যান্ডে ৯%, সাউথ কোরিয়ায় ১০% এবং তাইওয়ানে ১২%। একই সময়ে ভারতে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১.৩% মাত্র। ১৯৮৩-৮৪ সালে ব্যয় ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১০ বিলিয়ন, ১৯৮৪-৮৫-এ তা হয় ৩২ বিলিয়ন আর ১৯৮৫-৮৬ সালে ৩৬ বিলিয়ন। ১৯৬১ সালে বিদেশী ঋণ ছিল ১০৭৩ কোটি, ১৯৬৫ সালে ২৩৪১ কোটি আর ১৯৮০ সালে তা বেড়ে যায় চোদ্দ-পনেরো গুণ। ভারতীয় মূলধনের ৩০% বিদেশী ঋণ পরিশোধে ব্যয় হয়। ১৯৯০ সালে মোট জাতীয় উৎপাদন ছিল ৩.২% আর তার ৭৬% ব্যয় করা হয় বিদেশী ঋণ পরিশোধের জন্য। রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল খুব সামান্য। ১৯৮৯ সালে সরকারি কর্মীদের সংখ্যা

ছিল ১৮.৫ মিলিয়ন আর বেসরকারি এজেন্সিগুলিতে কর্মীসংখ্যা ছিল মাত্র ৭.৪ মিলিয়ন। ভারতীয় অর্থের অনেকটাই কর্মচারীদের বেতনের জন্য খরচ হয়ে যায়। ফলে সে সময় কোন উন্নয়নই সম্ভব হয়নি। ভারতের অধিকাংশ সরকারি কোম্পানিগুলিতে উপযুক্ত প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর অভাব ছিল এবং অত্যধিক বেশি কর্মীদের ভারে সেগুলি ভারাক্রান্ত ছিল। অল্প লাইসেন্স প্রদান করা হত। যারা লাইসেন্স মালিক ছিলেন, তাঁরা বিশাল শক্তিশালী অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য স্থাপন করতেন। সরকারি ক্ষেত্রের একচেটিয়া কারবারের ফলে প্রতিযোগিতা ব্যাহত হত এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিনিয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হত। রাষ্ট্র অধিকৃত সংস্থাগুলি বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়। লাইসেন্সরাজ্যের ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে দায়িত্বহীন স্থায়ী আমলাতন্ত্র এবং দুর্নীতি প্রাধান্য পেতে শুরু করে।

এগুলি ছাড়াও ভারতে তখন অভিনব ঋণ পরিশোধের হিসাব বা ব্যালান্স অফ পেমেন্ট সংকট দেখা দেয়। ১৯৮৫ থেকে ভারত এই সংকটের মুখে পড়ে এবং ১৯৯০-এর শেষে দিকে অবস্থা ভয়াবহ হয়। ভারত তখন ঋণ পরিশোধে অক্ষম বা ডিফল্টার অবস্থায় পৌঁছায়। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন ক্রেডিট দিতে অস্বীকার করে। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অবস্থা এমন হয় যে ভারত মাত্র তিন সপ্তাহের মত আমদানি ব্যয় করতে পারে। ভারতকে সুইস ইউনিয়ন ব্যাংকের কাছে ২০ টন সোনা এবং ব্যাঙ্ক অফ ইংলন্ডের কাছে ৪৭ টন সোনা বন্ধক রাখতে হয় এবং আই.এম.এফ.-এর সঙ্গে অর্থসংক্রান্ত চুক্তি সম্পাসন করতে হয়। ভারতের প্রায় দেউলিয়া অবস্থা হয়। ভারতকে তখন বিকল্প নীতি হিসাবে সমষ্টিগত অর্থনৈতিক সমন্বয় নীতি এবং কাঠামোগত সমন্বয় নীতি অনুসরণ করতে হয়। আই.এম.এফ.-এর চুক্তির শর্তের ভিত্তিতে ভারত সংস্কারমূলক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও দেশকে এই ব্যালান্স অফ পেমেন্ট সংকট থেকে মুক্ত করার জন্য অর্থনৈতিক সংস্কার নীতি গ্রহণে বাধ্য হন। তাঁর আমলের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং ভারতের নতুন সংস্কারমূলক অর্থনৈতিক নীতিটির ঘোষণা করেন, যা ছিল উদারনীতিবাদ (লাইসেন্স রাজের বিলুপ্তি, সরকারি একচেটিয়া ব্যবস্থার অবসান), বেসরকারিকরণ (বেসরকারি ক্ষেত্রকে উৎসাহ দান), এবং বিশ্বায়ন (বিদেশি বিনিয়োগ ও এফ. ডি. আই.-এর অনুমোদন) নীতি। ভারতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য তখন অর্থনৈতিক সংস্কার অনিবার্য ছিল। নরসীমা রাওয়ের অর্থনৈতিক সংস্কার বিলটি পার্লামেন্টে পাশ করা হয়, যদিও তাঁর দলের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সেখানে ছিল না। ৫২০টি আসনের মধ্যে পার্লামেন্টে তাঁর দলের মাত্র ২৩২টি আসন ছিল। সাত মাস পর পাঞ্জাবের নির্বাচন থেকে তাঁর দল আরও ১২টি আসন লাভ করে। প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য ২৭২টি আসন তাঁর দল সংগ্রহ করতে পারেনি। ডি.এম.কে. ও অন্যান্য আঞ্চলিক দলের সমর্থনে তাঁর দল শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছতে সক্ষম হয়—(২৩২+১২+২৮) বা ২৭২টি ভোট পায় (৫২০+২৩)টি আসনের মধ্যে।

রাও আমলের অর্থনৈতিক সংস্কার বিলটি ভারতীয় অর্থনীতিতে নতুন ধারার সংস্কারের সূচনা করে। অর্থনীতির ওপর বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা হয়, লাইসেন্স ব্যবস্থার অবসান ঘটে, শুল্ক বা করের হারের ক্রমাগত হ্রাস করা হয়, ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য ভারতীয় বেসরকারি সংস্থা এবং বিদেশি বেসরকারি ক্ষেত্রের উদ্যোগসমূহের কাছে ভারতীয় অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা হয় এবং জাতীয়করণ নীতির উল্টো পথে হাঁটা শুরু হয়।

উদারনীতিকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হল মূলধনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিপ্লব, মূলধনের ব্যবহারের পিছনে প্রধান

উদ্দেশ্য হল মূলধন থেকে মুনাফা বৃদ্ধি, সামান্য সুদের বিনিময়ে ব্যাঙ্কে অর্থ গচ্ছিত রাখা নয়। মূলধনকে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা সাবধানতার সঙ্গে বিনিয়োগ করতে হবে এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনসন প্রকল্প ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত অর্থ বাজারে বিনিয়োগ করতে হবে। ব্যাঙ্কে আমানত জমা রাখার ব্যবস্থা ছাড়াও মিউচুয়াল ফান্ডের ব্যবস্থা আছে—যেখানে সাবধানতার সঙ্গে তার ব্যবহারের কথা লেখা আছে। এখন অর্থনীতিতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদেশী মূলধনের ব্যবহার হচ্ছে। ভারতীয় বাজারের এখন তিনটি ধরন দেখা যায়—ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের বাজার, বিদেশি পণ্যদ্রব্যের বাজার এবং অর্থ বাজার।

নরসীমা রাওয়ের পর জাতীয় জনতা দলের নেতৃত্বে বাজপেয়ী পরিচালিত এন.ডি.এ. সরকার পাঁচ বছর ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে সংস্কারনীতি চালিয়ে যায়। বাজপেয়ী সরকার কর কমানোর ব্যবস্থা করে এবং সরকারি মালিকানাধীন ব্যবসা সংস্থাগুলিতে বেসরকারিকরণ করে—তার মধ্যে ছিল হোটেল, ভি.এস.এন.এল., মারুতি সুজুকি, বিমানবন্দর ইত্যাদি। রাজস্ব নীতির লক্ষ্য হয় ঋণ ও ঘাটতি হ্রাস।

২০১১ সালের শেষ দিকে কংগ্রেস পরিচালিত ইউ.পি.এ.-২ জোট সরকার খুচরো বাজারে ৫১% বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা এফ.ডি.আই.-এর ব্যবস্থার কথা বলে, কিন্তু জোটসঙ্গী দলগুলির এবং বিরোধী দলের চাপের জন্য তা প্রত্যাহার করে। তবে ২০১২ সালে তা আবার অনুমোদিত হয়।

২০১৫ সালে বি.জে.পি.-র নেতৃত্বে পরিচালিত নরেন্দ্র মোদির এন.ডি.এ. সরকার ইনসিওরেন্স বা জীবনবীমা ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করে দেয়—সেখানে ৪৯% পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বরদাস্ত করা হয়। তাছাড়াও কয়লা শিল্পকেও এই সরকার উন্মুক্ত করে দেয় এবং কয়লা খননের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটায়।

সংস্কার প্রক্রিয়া ও উদারিকরণ এখনও চলছে। এখন সব রাজনৈতিক দলই তা সমর্থন করছে। তবে তার গতি অনেক সময় কায়েমি স্বার্থ ও জোট রাজনীতির জন্য বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

৪.৬ উদারনীতিকরণের নতুন অর্থনৈতিক নীতি এবং এই সংক্রান্ত কিছু আইন

ভারতের নতুন উদারনীতিকরণ নীতির উদ্দেশ্যগুলি হল—

(ক) উচ্চতর অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার অর্জন।

(খ) মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস।

(গ) বিদেশী মুদ্রার তহবিল নির্মাণ।

ভারতের উদারনীতিকরণ কর্মসূচির বাস্তবায়নের জন্য ভারতীয় পার্লামেন্ট কিছু নতুন আইন পাশ করেছে। সেগুলির কয়েকটি হল—

(১) ফেমা (FEMA বা Foreign Exchange Management Act) : ১৯৭৩ সালের বিদেশি বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইনকে বাতিল করে ফেমা পাশ করা হয়, যার বিভিন্ন ধারাগুলি বহুজাতিক সংস্থাসমূহের ভারতে প্রবেশকে সহজতর করেছে। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) আমদানি রাজস্ব হ্রাস।

(ii) রপ্তানি সাবসিডির অপসারণ।

(iii) Current account-এ টাকার পূর্ণ রূপান্তরনীয়তা।

(iv) বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহদান।

(v) বিদেশি সংস্থার সঙ্গে দেশীয় সংস্থার যুক্ত উদ্যোগ।

(২) কয়লাখনি (বিশেষ ব্যবস্থা বিল), ২০১৫ [Coal Mines (Special Provisions Bill), 2015] : এই আইনটি কয়লা খননের ক্ষেত্রে সরকারি একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটায়, যা ১৯৭৩ সালে জাতীয়করণের পর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালিত হত। এই আইনটি কয়লা খনন ক্ষেত্রে বেসরকারি ভারতীয় ও বিদেশি মূলধন বিনিয়োগকে উৎসাহদান করে। দেশি ও বিদেশি বেসরকারি কোম্পানিগুলি কয়লার লাইসেন্সের জন্য টেন্ডারে যোগ দিতে পারে এবং বাণিজ্যিকভাবে কয়লা খনন করতে পারে। ফলে কয়লাশিল্পে লক্ষ লক্ষ ডলার বিনিয়োগের সম্ভাবনা, প্রযুক্তিগত উন্নতির সুযোগ এবং বিশালসংখ্যক কয়লাশ্রমিকের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের আশা থাকছে।

(৩) ২০০৫ সালের তথ্য অধিকার আইন [Right to Information (RTI) Act of 2005] : এই আইনটি সব রকম সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—কেন্দ্রীয় স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্থানীয় স্তর পর্যন্ত। এই আইন অনুসারে তথ্য হল আকরে যে কোন বিষয়—রেকর্ড, দলিল, উপদেশ, মতামত, আদেশ, চুক্তি, প্রতিবেদন, কাগজপত্র ইত্যাদি। এই আইনটি জনগণকে সরকারি সংস্থাসমূহের যে কোন তথ্য জানার সুযোগ প্রদান করে। সরকারি দলিল, ফাইল ইত্যাদি জনসমক্ষে হাজির করার ব্যবস্থা করে। এই আইনের ব্যবহারের ফলে সরকার জনগণের কাছে তার কাজের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকে এবং সরকারের সব কর্মচারীদেরকেই দেশের দরিদ্রতম নাগরিকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

৪.৭ ভারতীয় অর্থনীতিতে উদারিকরণের প্রভাব

তিনটি ক্ষেত্রে ভারতীয় অর্থনীতির ওপর উদারিকরণের প্রভাব দেখা যায়—

(i) গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থা ও গ্রামীণ অর্থনীতি ।

(ii) শিল্প ও বাণিজ্য।

(iii) প্রযুক্তিগত ও তথ্য সংক্রান্ত উন্নয়ন।

ভারতে উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের পর যন্ত্রপাতি, ফার্টিলাইজার বা সার (কৃত্রিম ও জৈবিক)-এর প্রয়োগ, উন্নত বীজের ব্যবহার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সাহায্য ইত্যাদির জন্য গ্রামীণ ভারতের কৃষি উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে প্রথম দিকে এই বৃদ্ধির হার বেশ কম ছিল পরে তার গতি বেশি হয়। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ও যানবাহনের উন্নতি ইত্যাদি গ্রামের নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়েছে, বিদ্যুৎ, টেলিভিশন, মোটরবাইক ইত্যাদি গ্রামীণ সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে, কম্পিউটার বা ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ইত্যাদি গ্রামে সহজলভ্য হয়ে গেছে। পঞ্চায়েতগুলি স্থানীয় স্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং তথ্যের প্রয়োগ ও প্রসারের

কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। এখন তৃণমূল স্তর পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রচেষ্টা চলছে। শিক্ষাকেন্দ্র বা স্কুল কলেজ ইত্যাদি গ্রামে পৌঁছে গেছে, যেখানে গ্রামের ছেলে ও মেয়েরা শিক্ষালাভ করছে। গ্রামের লোকদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা প্রচার মাধ্যমগুলির সাহায্যে তাদের মতামত প্রকাশ করছে। গ্রামেও প্রচারমাধ্যমগুলির উপস্থিতি লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন ভারী শিল্পের দ্রুত বিকাশ সম্ভব করেছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল ৮.৪%, এখন তা বহুগুণ বেড়ে গেছে। অর্থনীতিবিদ্‌দের ধারণা যে ২০২৫ সালে জাতীয় আয় ৬% থেকে ১১% বৃদ্ধি পাবে। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এখন তৃতীয় স্থানের অধিকারী—আমেরিকা ও চিনের পর। উদারিকরণ—বেসরকারিকরণ—বিশ্বায়ন ভারতের বাজার ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করেছে। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো ভারতও তার পুরনো অর্থনৈতিক আচরণ ও সাবেকি রীতিনীতির পরিবর্তন করেছে। এম.আর.টি.পি. আইন, ১৯৬৯ (সংশোধিত), করব্যবস্থার সংস্কার, মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ, বেসরকারিকরণ, বিনিয়ন্ত্রণ, বিদেশের সঙ্গে প্রযুক্তিগত চুক্তি, বিদেশি বিনিয়োগ, সাগর পারের লেনদেন ইত্যাদি ভারতে উন্নয়নের উপযোগী শিল্প পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বস্তুত, যে কোন অনুন্নত অর্থনীতির বিকাশ বা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে শিল্প উন্নয়ন অপরিহার্য্য।

ভারতে উদারিকরণজনিত সংস্কার নীতিসমূহের প্রবর্তনের প্রভাবে ভারতের সামগ্রিক বিদেশিক বিনিয়োগ (প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ, পোর্টফোলিও বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার থেকে উত্থিত বিনিয়োগ) ১৯৯১-৯২ সালের, ১৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১৯৯৫-৯৬ সালে ৫.৩ বিলিয়নে পৌঁছে যায়। মাথাপিছু জি.ডি.পি. (GDP) ১$\frac{১}{৪}$% থেকে বেড়ে ৭$\frac{১}{২}$% হয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে কয়েক বছরের মধ্যে তা দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

পরিষেবা ক্ষেত্রের মধ্যে যেসব দিকে নিয়ন্ত্রণ অনেক পরিমাণে তুলে দেওয়া হয় বা কমিয়ে দেওয়া হয়, সেসব দিকে সন্তোষজনক অগ্রগতি ও বিকাশ ঘটেছে, যেমন জীবনবীমা, যোগাযোগ ব্যবস্থা বা ইন্টারনেট যোগাযোগ, প্রযুক্তিগত পরিষেবা ইত্যাদি। এই সব ক্ষেত্রগুলিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যবস্থা হয়েছে এবং প্রতিযোগিতার দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছে। টেলিকম, বেসামরিক বিমান চলাচল ইত্যাদিতে বেসরকারি সংস্থাসমূহ কার্যকর অবদান রাখতে পেরেছে।

চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, নয়ডা, গুরগাঁও, গাজিয়াবাদ, পুনা, ইন্দোর, জয়পুর ও আহমেদাবাদ শহরগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে গেছে। তারা বিদেশি সংস্থানের দ্বারা বিদেশি বিনিয়োগের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। ভারত সরকারের উদারনীতিকরণের নীতি লাইসেন্স প্রথার কঠোরতা হ্রাস করে এবং বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণের ওপর নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করে বিদেশি বাণিজ্য ও এফ.ডি.আই.-এর পথ সুগম করেছে, ভারতীয় অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে সংযুক্ত করেছে এবং বিশ্বায়নকে সম্ভব করেছে। অতিরিক্ত সংরক্ষণপন্থী ভারতীয় বাজার বিদেশি কোম্পানি এবং বিনিয়োগকারীদের কাছে উন্মুক্ত করার পর শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে—গত দু'দশকে শিল্পের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ভারতের শিল্পক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ঘটেছে এবং ভারতের সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। শিল্প লাইসেন্স নীতি, শিল্পের স্থানগত নীতি, ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির জন্য নীতি, পরিবেশ নীতি ইত্যাদির পরিবর্তন হয়েছে এবং ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন নতুন দিকের উন্মোচন হয়েছে। তাদের

মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল সফটওয়্যার (Software) শিল্প, যা বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ১৯৯১-৯২ সালে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১৯৯৯-২০০০ সালে ৫.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে যায়।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ২০১৩ সালের ৩রা জানুয়ারী কলকাতায় অনুষ্ঠিত ১০০তম বিজ্ঞান কংগ্রেস অধিবেশনে জানান যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত ২০০৩ সালের নীতির পরিবর্তন করা হবে। তারপর সাতটি মিটিং-এ দীর্ঘ আলোচনা চলে, বিভিন্ন শিল্পের প্রতিনিধিরা এবং বিখ্যাত বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হয়ে ২০১৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ঘোষণা করেন। এর উদ্দেশ্য হল জৈব প্রযুক্তি (Biotechnology), রসায়ন বিজ্ঞান, পৃথিবীসংক্রান্ত বিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান ইত্যাদি সংক্রান্ত গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং মহিলা বিজ্ঞানীদের উৎসাহ প্রদান। ভারতের এই নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ছিল ভারতের দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংশ এবং পরবর্তী সময়ে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন ছিল এর লক্ষ্য। ভারতের নতুন উদারিকরণ নীতি ভারতে ওষুধ শিল্প উন্নতি ঘটিয়েছে, যা জনগণের স্বাস্থ্যোন্নতি, আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি সম্ভব করেছে। উদারনীতিকরণের নতুন নিয়ন্ত্রণগুলি ভারতের ইনসিওরেন্স ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উন্নতি করেছে, অধিকতর টেকসই (sustainable) উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছে এবং খাদ্যদ্রব্য ও শক্তিসংক্রান্ত ক্ষেত্রকে উন্নততর করেছে।

ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পগুলি হল সিমেন্ট, ইস্পাত, সফট্ওয়্যার, খনন কাজ, পেট্রোলিয়াম, ওষুধ ব্যবসা, যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং উল, সিল্ক ও মৃৎশিল্প। এইসব ধরনের শিল্পেই আধুনিকীকরণ ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়া দেখা গেছে। ভারত এখন বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানি ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI)-কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং প্রবাসী বা অনাবাসিকে ভারতীয় বা NRI-দের আকর্ষণীয় সুযোগ প্রদান করছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ ঘটছে। বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজ এবং সাধারণ কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যেগুলি লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর কাছে শিক্ষার সুবিধাগুলি পৌঁছে দিচ্ছে।

শেয়ারবাজার বা স্টকমার্কেট হল এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে কর্পোরেট নিরাপত্তা বা সিকিওরিটি নিয়ে লেনদেন বা ব্যবসা করা হয়, যা মুক্ত বাজারের প্রাণকেন্দ্র। ভারতীয় স্টক মার্কেট দ্রুতগতিতে বিকাশ লাভ করেছে এবং সেখানে শিল্প সংস্থাগুলি তাদের সিকিওরিটিসমূহকে স্বাধীনভাবে ক্রয় ও বিক্রয় করতে পারছে। উদারিকরণ নীতি গ্রহণের পর থেকে ভারতীয় বেসরকারি তথ্য প্রযুক্তি ও টেলিকম পরিষেবা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পেরেছে এবং ভারতীয় টেলিভিশন পরিষেবার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। ভারতের সফট্ওয়্যার পণ্যদ্রব্যের আমদানি বেড়ে গেছে, বৈদেশিক মুদ্রা আয়ও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩.৫ মিলিয়ন লোক সফটওয়্যার শিল্পে নিযুক্ত। তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত শিক্ষার চাহিদা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে ভারতে বেসরকারী তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষাকেন্দ্র ব্যাঙের ছাতার মত এখানে সেখানে গজিয়ে যাচ্ছে।

সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদনের গুণগত ও পরিমাণগত বৃদ্ধি ঘটেছে। তাছাড়াও তাদের মূল্য, শেয়ার মূল্য, অর্থসংক্রান্ত নীতি, বাজেট ইত্যাদি বর্তমানে আন্তর্জাতিক অর্থবাজার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। ভারতীয় জাতীয় অর্থনীতি এখন বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত।

৪.৮ উদারিকরণের অসুবিধাসমূহ

উদারনীতিকরণ কি একটি সর্বব্যাপী উন্নয়নের কৌশল কিংবা নয়, তা হল সাম্প্রতিক বিতর্কের বিষয়। তবে

ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে উদারনীতিকরণ যেসব অসুবিধার সৃষ্টি করে সেগুলির জন্য তার সমালোচনা করা হয়। সেই অসুবিধাগুলি হল—

ভারতে কৃষি হল অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ, যেখানে ৬০% লোক নিযুক্ত আছে। কৃষিক্ষেত্রের বৃদ্ধি ঘটেছে ধীর গতিতে। কৃষক তার জমির জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ বা দামি বস্তু বা সোনা বন্ধক রেখে বড় কোম্পানির কাছ থেকে সার বা প্রযুক্তি কেনে। উভয় ক্ষেত্রেই তাকে উচ্চ হারে সুদ প্রদান করতে হয়। যদি কৃষক তার প্রত্যাশিত উৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়, কিংবা যদি অতিরিক্ত বৃষ্টি বা খরার জন্য তার উৎপাদন নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা যদি সে তার উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য যথেষ্ট মূল্য না পায়, তাহলে সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। ২০০৯ সালের সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে গত পনেরো বছরে ২.৫ লাখ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিল নাড়ু, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে কৃষক আত্মহত্যার অসংখ্য উদাহরণ আছে। উদারিকরণ—বিশ্বায়ন—বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিকে তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। ২০০৯ সালে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে চুক্তি হয় যে ইউরোপীয় ইউয়িনভুক্ত দেশগুলি ভারতের বাজারে পাস্তুরিত বা স্কিম দুধ আমদানি করবে। দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যাপারে ১৪.৮ লক্ষ ভারতীয় যুক্ত আছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি থেকে স্কিম দুধ আমদানির ফলে তাদের আয় ৬০% কমে যায়। তাছাড়াও দেখা গেছে যে ৫০% লোক পোলট্রি ফার্মিং বা হাঁসমুরগী চাষের সঙ্গে যুক্ত। তারা ডিম বা মাংস বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। ইউরোপীয় বহুজাতিক সংস্থাগুলি এই বাজারেও প্রবেশ করছে। ফলে ভারতের পোল্ট্রি ফার্মিং ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা খাদ্য ও বাসস্থান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

৩৫ থেকে ৩৮ মিলিয়ন লোক ভারতীয় বাজারে বা রাস্তার ধারে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করে। বড় বড় বহুজাতিক সংস্থাগুলি, যেমন মেট্রো, বিগ বাজার, স্পেন্সার তাদের পেশাকে ব্যাহত করছে, কারণ তারা একই ছাদের নিচে বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। ফলে লোকে ঘুরে ঘুরে রাস্তা বা বাজার থেকে দ্রব্য ক্রয়ে কম উৎসাহ দেখায়।

২০০৫ সালে আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে ‘কৃষি, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, পরিষেবা ও বাণিজ্য সংযোগ সংক্রান্ত উদ্যোগ, বিষয়ে একটি চুক্তি হয়, যা এ.কে.আই. (AKI) নামে পরিচিত। এই চুক্তি অনুসারে কৃষি উৎপাদনের জন্য জিন প্রতিস্থাপিত বীজ (Gene manufactured seeds বা G.M.) ব্যবহৃত হবে। এই জাতীয় উৎপাদনের জন্য প্রচুর জল লাগে আর কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়, যার মধ্যে আবার আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড থাকে। জি.এম. উৎপাদন তাই আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড দূষণ বৃদ্ধি করছে। অর্থাৎ মাটির নিচের জলস্তরের পরিমাণ কমে যাচ্ছে আর দূষণ বৃদ্ধি ঘটছে। জি. এম. ব্যবহারের ফলে শুধু যে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে তাই নয়, জমিও নিস্ফলা হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়াও জি. এম. উৎপাদনের ফলে গ্রামীণ লোকদের মধ্যে দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা যাচ্ছে আর স্থানীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত কৃষি পণ্য হারিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় ৪০০০ ধরনের বৈচিত্র্যযুক্ত ধান ছিল, সেগুলির অধিকাংশই এখন আর পাওয়া যায় না। অত্যধিক নিয়ন্ত্রণমূলক শ্রম আইন, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, অতিরিক্ত দারিদ্র্য, কর্মসংস্থান হ্রাস, দুর্নীতি বা ঘুষের ক্রমবর্দ্ধমান উদাহরণ, প্রতারণার সংখ্যা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক ইচ্ছা ও মতৈক্যের অভাব এবং আয়গত বৈষম্য বৃদ্ধি—এই বিষয়গুলি ১৯৯২ থেকে শিল্পক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। দেখা গেছে যে দরিদ্রদের মধ্যে খরচের পরিমাণ স্থিতিশীল, কিন্তু ধনীদের খরচ বৃদ্ধির প্রবণতা প্রবল। তাছাড়াও ২০১২-১৩ সালে ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি খুব কম ছিল—৫% মাত্র।

নতুন সংস্কারমূলক অর্থসংক্রান্ত নীতি রপ্তানি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং খাদ্য ও ক্যালোরির দিক থেকে পুষ্টি বৃদ্ধি ঘটাতে পারেনি এবং কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ঘাটতি বাড়িয়ে দিয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে সাইবার অপরোধ বেড়ে গেছে, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

ভারতের ১৭% কৃষক ৮০% জমির অধিকার ভোগ করে, আর ৮৩% কৃষকের মাত্র ২০% জমির এক্তিয়ার আছে। জমিহীন কৃষকদের জমির অধিকার দেওয়া যায়নি। ১৮৯৪ সালের জমি অধিকার আইন এখনও অপরিবর্তিত, যদিও ব্যবসামালিক ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে তার পরিবর্তন প্রয়োজন।

খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সব বিষয়ই অতিজাতিক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন, যেমন ভারতের টাটা, আম্বানি ইত্যাদি শিল্পপতিদের উদ্যোগ বা বিদেশী অতিজাতিক সংস্থা, যেমন ওয়ালমার্ট। এর ফলে ভারতীয় ও বিদেশি শিল্পমালিক বা বহুজাতিক সংস্থাগুলির ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশীয় সাধারণ উদ্যোগের ক্ষতি হচ্ছে।

ভারতে অতি-আধুনিক ও অতি-প্রাচীন উৎপাদন ধারা পাশাপাশি অবস্থান করে—ব্যক্তিগত আইন বোর্ড ও খাপ্ বা ক্যাঙ্গারু কোর্ট পাশাপাশি দেখা যায়। সম্পদ ও দারিদ্র্যের পাশাপাশি অবস্থান হল ভারতের সামাজিক বৈশিষ্ট্য। ভারতে বড় বড় মনোরম প্রাসাদোপম অট্টালিকার পাশেই দেখা যায় নোংরা অস্বাস্থ্যকর বাসগৃহ বা বস্তি।

তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব ও তথ্যের অবাধ যাতায়াত এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে ভারতে সন্ত্রাসবাদের ঘটনা ও সন্ত্রাসবাদী ধ্বংসপ্রবণতা অনেক গুণ বেড়ে গেছে।

ভারতে উদারিকরণের ফলে সাধারণভাবে শিল্পক্ষেত্রের অনেক উন্নতি ঘটেছে। যদিও তা যথেষ্ট উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয়। তাই আমদানির বিকল্প সন্ধান সম্ভব হয়নি। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দিকে গবেষণা কাজের ক্ষেত্রেও অনেক ঘাটতি দেখা গেছে। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে বিপুল সংখ্যক সরকারি ক্ষেত্রের অবলুপ্তি বা ধ্বংস ঘটেছে। অসুস্থ শিল্প এককগুলিকে অপসারণ করা হচ্ছে। চাকরি ক্ষেত্রের ওপর তার গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বায়ন ও বিশ্ববন্ধন ভারতের জাতীয়তার ভিত্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। ফলে ভারতীয় রাষ্ট্র বা ভারতীয় জাতির ধারণা এখন দুর্বল হয়ে গেছে ; পরিবর্তে পশ্চিমীকরণ বা পশ্চিমী সংস্কৃতির অনুকরণ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রবণতা দেশীয় সংস্কৃতির ধ্বংস ডেকে আনছে।

৪.৯ উদারিকরণের সুবিধাসমূহ

ভারতে উদারিকরণের নীতি গৃহীত হওয়ার পর প্রথম দিকে কৃষিক্ষেত্রের বেশি উন্নতি ঘটেনি। তবে শীঘ্রই ভারতীয় কৃষকরা কয়েকটি বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে, যেমন গম, ধান, মেজ ইত্যাদি শস্যের উৎপাদন, সর্ষের তেল, সূর্যমুখী তেল ইত্যাদি তৈলবীজ থেকে উৎপাদন, আখ, বিট ইত্যাদি চিনি উৎপাদনকারী উদ্ভিদ, ডাল, চা, কফি ও ওষুধ উৎপাদনকারী প্রকল্প। ভারতের বাসমতী চাল রপ্তানি থেকে বিদেশি মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। ভারতীয় তুলসি গাছও রপ্তানির অন্যতম বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি ও সফটওয়্যারে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অনেক চাকরি সৃষ্ট হয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে এই সব বিষয়ের

ওপর ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের চাহিদা বেড়ে গেছে। ভারতে বি.পি.ও. ও কে.পি.ও. বুম পরিলক্ষিত হয়েছে। এগুলি থেকে ভারতের রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা আয় বেড়ে গেছে।

উদারনীতিকরণ ভারতে নীতিগত নমনীয়তা, শিল্প উৎপাদনের গুণগত ও পরিমাণগত বৃদ্ধি, গবেষণার নতুন সুযোগ ও সৃজনশীলতার অগ্রগতি এনেছে। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের বিভিন্ন সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা গেছে। এই প্রতিযোগিতার ফলে দক্ষতা ও কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও সংবেদনশীলতা, ব্যবসাসংক্রান্ত উচ্চ ধরনের কৌশল এবং আধুনিক বাণিজ্য নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতে সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি ঘটেছে। সরকারি ক্ষেত্রের অনেক কাজ এখন চুক্তি দ্বারা বেসরকারি সংস্থাসমূহকে প্রদান করা হচ্ছে আর আমলাতন্ত্রের কিছু কাজ বেসরকারি সংস্থা ও এন.জি.ও.গুলিকে হস্তান্তরিত করা হচ্ছে। সরকার মন দিচ্ছে শুধুমাত্র সমাজের নিচুতলার বাসিন্দদের জন্য উন্নয়নমূলক কাজগুলির প্রতি। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা ও ক্রিয়াকলাপ এখন অনেক পরিমাণে হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনীতির ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অনেক শিথিল করা হয়েছে। ফলে প্রশাসনের ওপর কাজের চাপ অনেক কম হয়েছে।

বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং তাদের বিশেষীকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি শুধু যে উৎপাদনের পরিমাণগত ও গুণগত উন্নতি এসেছে তাই নয়, মূল্য হ্রাস, প্রযুক্তিগত ও পরিচালনা সংক্রান্ত উন্নয়ন এবং জনগণের জীবনযাত্রার উচ্চতর মান সম্ভব করেছে। আধুনিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াগুলি প্রশাসনিক দক্ষতাবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। সাবেকি প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় ফাইল সংরক্ষণ, গোপনীয়তা, দীর্ঘসূত্রতা এবং লাল ফিতের বাঁধন গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এগুলির বদলে এখন দেখা যাচ্ছে বিনিয়ন্ত্রণ, তথ্য যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, দ্রুতগতিতে কাজ, কম্পিউটারের ওপর নির্ভরতা, সরকারি দপ্তরের কর্মীসংখ্যা হ্রাস ইত্যাদি।

প্রশাসনসংক্রান্ত তথ্যসমূহ এখনকার উদারনৈতিক ভারতে সহজলভ্য। যোগাযোগ ও প্রচারমাধ্যমসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ইন্টারনেটের সুযোগের ফলে ভারতের জনগণ এখন সরকার, প্রশাসন এবং বিভিন্ন ব্যবসা সংগঠন সম্বন্ধে তথ্য জানতে পারছে। তারা এইসব মাধ্যমগুলিতে তাদের মতামতের প্রতিফলিত করতে পারছে। এগুলি প্রশাসন সম্বন্ধে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করছে এবং প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করছে।

উদারনীতিকৃত ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রশাসনের অনেক কাজ এখন সাম্প্রতিক তথ্যসমৃদ্ধ। বর্তমানে র‍্যাশন কার্ড প্রস্তুতি, জাতীয় ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি, জমিসংক্রান্ত রেকর্ডের হিসাব, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পেন্সন জাতীয় ইনসিওরেন্স ইত্যাদি আধুনিক তথ্য যুক্ত। অর্থাৎ উদারিকরণ—বেসরকারিকরণ—বিশ্বায়ন ভারতীয় সরকারের কাজ ও দায়িত্বভারকে সীমাবদ্ধ ও লঘু করেছে, কিন্তু বেসরকারি ক্ষেত্রের কাজ ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করেছে। শুধু ভারতীয় বেসরকারি সংস্থা নয়, বিদেশি বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও আধুনিক ভারতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে; বিশ্ব অর্থনীতিতে পরস্পর-নির্ভরশীলতা ও ঐক্যপ্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় অর্থনীতি এখন বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে এবং ভারতে বিদেশি মূলধনের অবাধ প্রবাহ দেখা যাচ্ছে। ভারত এখন প্রবলভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে। নতুন উদারিকরণ—বিশ্বায়ন—বেসরকারিকরণ নীতি ভারতে প্রযুক্তিগত বিপ্লব, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, সম্পদের সন্তোষজনক ব্যবহার, মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, উচ্চস্তরের নাগরিক জীবনযাত্রা, খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ইত্যাদি সম্ভব করেছে। তথ্য প্রযুক্তি ও টেলিকম ক্ষেত্রের উন্নতি হয়েছে, অবাধ বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার জন্য

ভারত এবং অন্য একটি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়েছে। ভারত এখন সার্ক, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও ডব্লিউ.বি.টি.ও, (SAARC, United Nations & WTO)-র সদস্য। ভারত সরকার উপলব্ধি করেছে যে অন্যান্য দেশের বিভিন্ন দিকের পরিবর্তনের প্রতি নজর না রাখলে ভারতীয় ব্যবসাবাণিজ্য টিকে থাকতে পারবে না। ভারত এখন বিশ্ব অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং অনেক রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসার অংশীদারিত্বে যুক্ত। বর্তমান বিশ্বে পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ বিশ্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হচ্ছে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বাজপেয়ীর নির্বাচন এবং তাঁর উদারনীতিকরণ—বেসরকারিকরণ—বিশ্বায়ন কর্মসূচি (মুক্ত অর্থনীতি, বেসরকারি ক্ষেত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকে উৎসাহ) ভারতীয় অর্থনীতিতে কাম্য পরিবর্তন ছিল। তিনি সমাজকল্যাণ ও সংরক্ষণমূলক অভিভাবকের পুরনো নীতিকে পুরোপুরি বিদায় জানান। বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বের অল্পদিন পরেই পশ্চিমের দেশগুলি ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি ও বি.পি.ও.-কে পছন্দ করতে থাকে এবং ২০০৪ সালে তারা ভারতে বিনিয়োগ নিয়ে বিশেষ চিন্তাভাবনা করে। বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বের শেষ দিকে বিদেশি বিনিয়োগের উপযোগী কাঠামো গড়ে তোলা হয়। পরবর্তী সরকারগুলি ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য সেই কাঠামোকে আরো দৃঢ়তর করে। এ.টি.কিয়ারনির মতে কারখানাজাত উৎপাদন, টেলিকম ও উপভোগ সংস্থাগুলির মধ্যে ভারতের শক্তিশালী ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা যায়।

৪.১০ উপসংহার

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের জন্য সংস্থা (Organisation for Economic Cooperation and Development বা OECD)-র প্রতিবেদনে ভারতের সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা হয়। সেখানে বলা হয় যে শ্রমবাজারে সেই সব সংস্থাগুলিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয়েছে, যেগুলিতে শ্রম আইনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আর সেইসব ক্ষেত্র, যেখানে শ্রম আইন কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয়, সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমহ্রাসমান। সেই সব ভারতীয় সংস্থাগুলি ক্রমশ মূলধনভিত্তিক হয়ে পড়েছে, যদিও দেশের মধ্যে প্রচুর সংখ্যায় ও সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যায়। ব্যাপক-ভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভব করার জন্য এবং ক্রমবর্দ্ধমান শ্রমশক্তির জন্য পর্যাপ্ত ও উচ্চ ধরনের কর্মসংস্থানের জন্য শ্রম-বাজারের সংস্কার প্রয়োজন।

পণ্যদ্রব্যের বাজারে অদক্ষ সরকারি পদ্ধতিসমূহ উদ্যোগপতিদের কাছে বাধা হিসাবে প্রতিভাত হয়। সেগুলির পরিবর্তন প্রয়োজন। সরকারি কোম্পানিগুলি বেসরকারি কোম্পানিগুলির তুলনায় কম উৎপাদনশীল। তাই বেসরকারিকরণ কর্মসূচিকে পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন।

অর্থবাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এবং কিছু পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে উন্নয়নের ব্যাপারে বাধাগুলির দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। পরোক্ষ কর ব্যবস্থার সরলীকরণ প্রয়োজন, যাতে প্রকৃত জাতীয় বাজার গড়ে উঠতে পারে, তা দেখা প্রয়োজন আর প্রত্যক্ষ করের বোঝা কমানো প্রয়োজন। সরকারি খরচ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করতে হবে এবং সাবসিডি কমাতে হবে। সামাজিক সুযোগসুবিধা দরিদ্রদের কাছে যাতে পৌঁছতে পারে, এমন সামাজিক নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে মানব মূলধন বৃদ্ধি করতে হবে।

OECD রিপোর্টের উপসংহারে বলা হয় যে যদি পরিকাঠামো, শিক্ষা ও মূল পরিষেবাগত উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে ভারতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে এবং দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।

৪.১১ নমুনা প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্নাবলী :

(১) পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিত থেকে উদারনীতিবাদী দর্শনের আলোচনা করুন।

(২) সদ্যস্বাধীন ভারতে সামাজিক কল্যাণ ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন সংক্রান্ত অর্থনৈতিক নীতিটি ব্যাখ্যা করুন।

(৩) বিংশ শতকের শেষ দিকে ভারত সরকার কেন উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করে?

(৪) ভারতীয় অর্থনীতিতে উদারীকরণ নীতির প্রভাব আলোচনা করুন।

(খ) মাঝারি প্রশ্নাবলী :

(১) উদারীকরণ নীতির কি কি সুবিধা আছে?

(২) উদারীকরণ নীতির কি কি অসুবিধা দেখা যায়?

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

(১) উদারনীতিবাদ বলতে কী বোঝেন?

(২) সামাজিক কল্যাণ নীতিটি স্বাধীনতার কিছু বছর পর ভারত সরকার কেন পরিত্যাগ করেছিল?

(৩) ভারত সরকার দ্বারা গৃহীত নতুন অর্থনৈতিক নীতির কি কি উদ্দেশ্য ছিল?

(৪) ভারতে উদারীকরণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভারতীয় সংসদ দ্বারা গৃহীত চারটি আইনের উল্লেখ করুন।

৪.১২ গ্রন্থপঞ্জী

Chandrasekharan, Balkrishnan, *Impact of Globasation on Developing Countries and India.*

Gills, S. and Law, D., *The Global Political Economy : Perspectives, Problems and Policies*, John Hopkins University Press, Baltimore, 1988.

Goyal, Krishnan A., ''Impact of Globalisation on developing countries with special reference to India'', *International Journal of Finance and Commerce,* issue 5.

Hettne B and others, *Globalisation and the New Regionalism*, MacMillan Press Ltd., London, 1999.

Todaro, M. P., *Economic Development*, Longman, New York, London. 1994.